২৪৯

# সাপ্তাহিক বুলেটিন

ফাল্গুন ১৪২১
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

# সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৪৯ ফাল্গুন ১৪২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

## সূ চি প ত্র

৩ **সৈয়দ মামুনুর রশীদ**
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ: উন্নয়নকর্মী ও নারীনেত্রী

৬ **শাওয়াল খান**
অমর একুশ: ভাষা আন্দোলনের গৌরবদীপ্ত নারী

১৩ **শফি আহমেদ**
একুশ ও অসাম্প্রদায়িকতা

১৬ **জিয়াউল হাসান**
বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রসঙ্গ

১৯ **তপন কুমার দাশ**
মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা: চ্যালেঞ্জ ও অগ্রগতি

২৩ **শহীদুল্লাহ শরীফ**
শিশুর মাতৃভাষা-শিখনের প্রয়োজনীয়তা

২৫ **বিশেষ প্রতিবেদন**
কমিউনিটি রেডিওতে "সেক্সুয়াল অ্যাণ্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস্" (এসআরএইচআর) এডুকেশন বিষয়ক নাটিকা

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

# শামসুন্নাহার রহমান পরাণ: উন্নয়নকর্মী ও নারীনেত্রী

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, আমাদের পরাণ আপা ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের একজন অন্যতম সুহৃদ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ঘাসফুল গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগি সংগঠন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত সেই সুবাদে চট্টগ্রামে গণসাক্ষরতা অভিযানের বহু কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঘাসফুল-এর সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। পরাণ আপা জাতীয় পর্যায়েও গণসাক্ষরতা অভিযানের নানা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। তার উপদেশ পরামর্শ ও সহযোগিতা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে।

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ-এর জন্ম ১৯৪০ সালে জুন মাসে। তাঁর মা মরহুমা সাজেদা খাতুন এবং বাবা মরহুম মৌলভী আমির হোসেন মজুমদার। বাবা ছিলেন তৎকালীন ঋণ সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও জুরি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য। মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে শামসুন্নাহার রহমান পরাণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তার স্বামী মরহুম লুৎফুর রহমান ছিলেন চট্টগ্রামের খ্যাতিমান আয়কর উপদেষ্টা। তাদের চার মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়ে পারভীন মাহমুদ এফসিএ। পারভীন মাহমুদ আইসিএবি-এর প্রথম নারী সভাপতি ও বর্তমানে গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত। মেজ মেয়ে ইয়াসমীন আহমেদ একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। একমাত্র ছেলে আফতাবুর রহমান জাফরী জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। সেজ মেয়ে শামীম রহমান রুবা ও ছোট মেয়ে ঝুমা রহমান বিদেশে বসবাস করছেন।

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিকালে চট্টগ্রামে বন্দুক চালনা ও ফার্স্ট-এইড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এবং তিনি এই অর্জিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম এবং গ্রামের মহিলাদের আত্মরক্ষা এবং অন্যদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গ্রামে গ্রামে রিক্সা নিয়ে ঘুরে ঘুরে যুবকদের দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, "পাকিস্তনিদের হাতে নিশ্চুপ নির্মম হত্যার শিকার না হয়ে বীরত্বের সাথে মুক্তিযুদ্ধে যাও"।

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশ গঠনে স্ব-প্রণোদিত হয়ে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাহাত্তর সালের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পরিবার, পারিবারিক বন্ধু ও ঘনিষ্ঠদের সহযোগিতায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল। সমাজে অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে, বিশেষ করে দরিদ্র, লাঞ্ছিত নারী এবং ক্ষুধার্ত শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে কিছু করার জন্য মনোনিবেশ করেন। তিনি সদ্য গঠিত ঘাসফুল-এর মাধ্যমে শুরুতে ত্রাণ প্রদানের কাজ শুরু করেন। তিনি দলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতীক হিসেবে সংগঠনটির নাম দিলেন, ঘাসফুল। প্রকৃতিতে ঘাসফুল যেমন ফুল হয়ে ফুটলেও ফুলের মর্যাদা পায় না, নির্বিচারে কিংবা অকারণে পদদলিত হয়, তেমনি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত তৃণমূল জনসাধারণ মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেও মানুষের মর্যাদা পায় না। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে পাহাড়সম প্রতিকূলতার মাঝে ঘাসফুল নিভৃতে নিরলসভাবে কাজ করতে থাকে চট্টগ্রাম শহরের বস্তিতে বস্তিতে। নিরবচ্ছিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টার

ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রাম জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে এবং এতে প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম বিভাগের প্রথম রেজিস্ট্রার্ড এনজিও'র মর্যাদা পায়। এরপর ১৯৯০ সালে ঘাসফুল এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো'র নিবন্ধন পায়। তারপর শুধুই এগিয়ে চলা। সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষদের জীবন-জীবিকার সার্বিক মান উন্নয়নে ঘাসফুল তার কর্ম-এলাকা ও কর্ম-পরিধি বৃদ্ধি করে। মানবিক এ কর্মযজ্ঞ দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশ-বিদেশে। দাতা সংস্থা এ্যাকশনএইড-এর সহায়তায় ঘাসফুল প্রথম ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে ১৯৯৭ সালে। এরপর পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে ঘাসফুল বিস্তৃত হয় বৃহত্তর চট্টগ্রামসহ দেশের ছয়টি জেলায়। বর্তমানে ঘাসফুল ৩৭টি শাখার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৮২-৮৩ সালে পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-এর বিশেষ অনুদান লাভ করে ঘাসফুল।

কায়রো সম্মেলনের পরে ১৯৭০ সালে আর্ন্তজাতিক নারী উন্নয়ন দশক ঘোষিত হয়। সেই নারী উন্নয়ন দশকের শুরু থেকে ঘাসফুল-এর মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত এবং ঢাকার নারী উন্নয়ন দশকের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নারী উন্নয়নে এখনো কাজ করে যাচ্ছে এই সংস্থা। ১৯৭৫ সালের পর থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত নারী উন্নয়নের দ্বিতীয় ধাপ। নারী উন্নয়ন কর্মসূচির দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয় বিশ্বময়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে নারীর চোখে বিশ্ব প্রতিপাদ্য নিয়ে চীনের বেইজিংএ অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী উন্নয়ন সম্মেলনে যোগদান করেন শামসুন্নার রহমান পরাণ। উক্ত সম্মেলনে নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে বিভিন্ন অধিবেশনে প্রচারপত্র বিতরণ করেন। ওই সময়ে ঢাকা থেকে রংপুর যাওয়ার পথে ইয়াসমীন নামে এক নারী গৃহকর্মী পুলিশ কর্তৃক নির্মম পাশবিকভাবে ধর্ষিত হয় এবং মৃত্যু বরণ করেন। তিনি বাংলাদেশের অন্যান্য নারী নেত্রীদের সাথে নিয়ে এর প্রতিবাদ করেন।

সমাজসেবায় ব্রতী শামসুন্নাহার রহমান পরাণ-এর অনন্য কীর্তি ঘাসফুল। এ প্রতিষ্ঠানকে তিনি নিয়োজিত করেছেন সমাজের অনগ্রসর মানুষের টেকসই উন্নয়নে। এ কারণে গার্মেন্টসকর্মী থেকে শুরু করে বস্তিবাসী জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইনি সেবা, ক্ষুদ্র ঋণ ও মানবাধিকারসহ জীবনঘনিষ্ঠ সকল বিষয়ই হয়ে উঠেছে ঘাসফুল-এর এজেন্ডা। বর্তমানে উল্লেযোগ্য বিভিন্ন কার্যক্রম হল:

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম (৬টি জেলা)

সাধারণ স্বাস্থ্য কার্যক্রম (চট্টগ্রাম জেলা)

প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা (চট্টগ্রাম জেলা)

গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা (চট্টগ্রাম জেলা)

মা ও শিশুস্বাস্থ্য (চট্টগ্রাম জেলা)

**সরকারী সহয়তায় শিশুদের টিকা প্রদান**

এইডস প্রতিরোধে বহুমুখী কার্যক্রম (৬টি জেলা)

দরিদ্র মানুষের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম (চট্টগ্রাম জেলা)

শিশু-কিশোরদের সাংস্কুতিক বিকাশ (চট্টগ্রাম জেলা)

ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত শিশুদের সূরক্ষা এবং শিক্ষা (চট্টগ্রাম জেলা)

মানবাধিকার ও পারিবারিক সহিংসতা রোধ (চট্টগ্রাম জেলা)
ক্ষুদ্র জীবন বীমা (৬টি জেলা)

কৃষি, সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা (৬টি জেলা)
পশুসম্পদ ও প্রানিসম্পদ উন্নয়ন (৬টি জেলা)

তথ্য প্রযুক্তি (চট্টগ্রাম জেলা)

নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানী (৬টি জেলা)

**অভ্যন্তরীণ অর্থ গ্রহণ ও প্রেরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ**

চক্ষু চিকিৎসাসেবা (নওগাঁ জেলা)

সু-শাসন-রেড ক্যাটল চিটাগাং কর্মসূচি (চট্টগ্রাম জেলা)

বন্ধুচুলা প্রচলনে

সচেতনতামুলক কার্যক্রম (৬ জেলা)।

সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি কখনোই এড়িয়ে যাননি শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। চট্টগ্রামসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা পরিচালনা এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ১৯৮৭-৮৮ সালে 'লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগং'-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি ১৯৯৫ সালে লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগং পারিজাত-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ২০০৮ সালে লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগং পারিজাত এলিট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লায়ন্স-এর একজন সম্মানিত মেলভেজোন ফেলো (এমজেএফ)। ১৯৮৯-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ মহিলা সমিতি চট্টগ্রাম-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ১৯৮৯ সাল থেকে চিটাগং ওয়ার্কিং ওমেন্স কো-অপারেটিভ লিঃ এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম কারাগার ও চিটাগং মিউনিসিপ্যালটির ইন্সপেক্টর এবং কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। চট্টগ্রাম লেখিকা সংঘ-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ঢাকার নন্দিনী প্রকাশনা থেকে তাঁর যৌথভাবে পাঁচটি ছোটগল্পের বই প্রকাশিত হয়।

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ১৯৯২ সাল থেকে জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল ও সাউথ এন্ড সেন্ট্রাল এশিয়া রিজিওনাল কনফারেন্স অন এডুকেশন ফর অল-এর সদস্য। এছাড়া তিনি

ন্যাশনাল টিবি এসোসিয়েশন (নাটাব), ফ্যামেলী প্লানিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, রেড ক্রিসেন্ট, রোগী কল্যাণ সমিতি, চিটাগং ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল, অটস্টিক স্টুডেন্ট ডেভলেপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার চিটাগং (এসিডিডব্লিউসি), প্রাক্তন সভাপতি লেখিকা সংঘ, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি ওমেন-এর প্রাক্তন সভাপতি ও আজীবন সদস্যপদসহ বিভিন্ন সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণচুড়া কেজি স্কুল-এর প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিস ট্রাষ্ট (ব্লাষ্ট)-এর উপদেষ্টা, ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের অনারারী প্রিন্সিপাল, বাংলাদেশ প্রবীণ অধিকার ফোরাম ও এইজিং রিসোর্স সেন্টার-ফোরাম ফর দ্য রাইট্স অব দ্য এলডারলি-এর প্রতিষ্ঠাতা ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সাজেদা পল্লী স্বাস্থ্য ও পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, Bangladesh Association for the Aged and Institute of Geriatric Medicine (BAAIGM)-এর আজীবন সদস্য ছিলেন।

বর্তমানে দেশের বিলুপ্ত ফুল ও ফলের গাছ উৎপাদন সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন স্থানে গাছের চারা বিতরণ ও রোপণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ২০১৪ সালে চট্টগ্রামের ডিসি মহোদয়-এর সহায়তায় জেলা প্রশাসক পাহাড়ে (ডিসি হিলে) ১২০টি দেশীয় খেজুর গাছের চারা লাগিয়েছেন। গ্রামে পলাশ, কৃষ্ণচূড়া ও বটগাছ লাগান। চৌদ্দগ্রাম উপজেলার স্কুল, এতিমখানা, কবরস্থান ও হাটবাজারে ছায়াদানকারী গাছ লাগিয়েছেন। বিটিসি থেকে সংগ্রহ করে ইপিল গাছ গ্রামের ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করেন। এখন অনেক মহিলা এই গাছের চারা বিক্রি করেন। এই গাছের ডাল জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁওস্থ লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে কয়েকশ গাছ লাগিয়েছেন তিনি। লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েক লক্ষ টাকার সম্পদ হয়েছে। বৃক্ষরোপণ দিবসে এই এলাকার কন্যাশিশুকে ফলবান নারিকেল গাছ দিয়েছেন। নারিকেল বিক্রি করে মা-মেয়ের আয় হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে তিনি নিম গাছ লাগিয়েছেন মানুষের সুবিধার্থে । তিনি নিম ফাউন্ডেশন-এর উপদেষ্টাও ছিলেন।

সৃজনশীল কর্মকান্ডের সঙ্গেও শামসুন্নাহার রহমান পরাণ নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে' ও উপলব্ধির আঙিনা' তাঁর ছোটগল্পের সংকলন। 'সুবচন সংগ্রহ', 'তৃণমূলের অভিজ্ঞ রমণী' ও 'সৃজনে-মননে' তাঁর প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতার বিবরণী। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংকলন 'স্মরণে বিস্মরণে' দ্রুত প্রকাশের পথে। ১৯৬৯-৭১ সালে 'একঘর বাঙালী' সম্পাদনা করতেন। গণজাগরণ সৃষ্টি করাই ছিলো তার লেখনীর একমাত্র উদ্দেশ্য।

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশে সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে তিনি ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীন, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অনন্য ভূমিকার জন্য শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ও তাঁর প্রতিষ্ঠান 'ঘাসফুল' বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছে। ১৯৯০ সালে তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠান 'ঘাসফুল' চট্টগ্রামের সেরা এনজিও হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করে। এ ছাড়াও ১৯৯৭ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে তিনি সেরা এনজিও হিসেবে পদক লাভ করেন। ঘাসফুল-এর সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ত সু-সংগঠিত হওয়ায় যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামসহ উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, গবেষকেরা হাতে-কলমে ক্ষুদ্রঋণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম শিখতে এখানে আসছে। বর্তমানে ঘাসফুল তার উন্নয়নের বার্তা নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের দরজায় পৌঁছে গেছে।

মহীয়সী নারী শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ৬.৫৫ মিনিটে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

**সৈয়দ মামুনুর রশীদ**

ব্যবস্থাপক, ঘাসফুল

শা ও য়া ল খা ন

# অমর একুশ: ভাষা আন্দোলনের গৌরবদীপ্ত নারী

১৯৫২

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবের ইতিহাস, গৌরবের দিন। এখন এই গৌরবের ইতিহাস বিস্তার লাভ করেছে বিশ্ববাসী। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শুধু ভাষা আন্দোলনের শহীদ দিবস নয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসও। আন্তর্জাতিক এই স্বীকৃতি আমাদের ভাষা শহীদদের আত্মদানকে সম্মানিত করেছে, আমাদের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা জানি, ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার ভিত্তিও রচিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতেই। সেই ইতিহাস নিয়ে আমাদের গর্ব আছে, আছে পূর্বসূরিদের প্রতি এই প্রজন্মের গভীর শ্রদ্ধাবোধ। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের ছয় দশকের বেশি সময় অতিক্রম করেও প্রকৃত ভাষাসৈনিকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা জনসমক্ষে নেই।

অর্থাৎ এখনো জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ভাষা আন্দোলনের যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। ভাষাসৈনিকদের কোনো তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি। ভাষা শহীদ ও সৈনিকদের সঠিক সংখ্যা ও পরিচিতি উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি। হয়নি নারী ভাষাসৈনিকদের যথাযথ মূল্যায়নও।

মহান ভাষা আন্দোলনের ছয় দশক পর নারী ভাষাসৈনিকরা তাদের অবদানের কতটুকু স্বীকৃতি পেলেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে ভাষাসৈনিক রওশন আরা বাচ্চুকে বলতে শুনি, 'ব্রিটিশ ভারতে আমার জন্ম। গোলামির জিঞ্জির দেখেছি। অনেক অত্যাচারিত হয়েছি। সে সময় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ আমাদের নাড়া দিত। নেতাজীর ভূমিকা আমাদের আলোড়িত করত। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, আমার দাদাকে খান বাহাদুর খেতাব দেন। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। স্বদেশী আন্দোলন দেখেছি। মা ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান গাইতেন। বাড়ির রাজনৈতিক পরিবেশে মুক্তিকামী ও সচেতন হয়ে উঠি। আমরা মুসলমান মেয়েরা পিছিয়ে ছিলাম। অবিভক্ত ভারতবর্ষে জাতিভেদ ছিল। মুসলমান বলে স্কুলে হাত দিয়ে পানি খাওয়া বারণ ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এমন করত।

১৯৫২ সালে আমি উওম্যান রেসিডেন্সে ছিলাম। যা বর্তমান রোকেয়া হল। হোস্টেল তখন ৩২-৩৩ জন ছাত্রী আর পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে সব মিলিয়ে ৬০-৭০ জন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১২টায় মিটিং শুরু হল। ভাইস চ্যান্সেলর ছাত্রীদের কাছে ১৪৪ ধারা না ভেঙে শান্তিপূর্ণ কার্যক্রমের অনুরোধ জানায়। ছাত্রীরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। গাজীউল হকের সভাপতিত্বে মিটিং শুরু হল। শহীদ খান বেদির ওপরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে লাগল, ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। গাজীউল হক মতিন ভাইকে ডাকলেন। মতিন ভাই বললেন, আপনারা কী চান? সবাই একসঙ্গে বলল, ১৪৪ ধারা ভাঙবই ভাঙব।

আমরা আমতলায় কথা বলছি। সিদ্ধান্ত হয় ১০ জন করে একেকটা দল বের হবে। সব দলে একজন করে ছাত্রী থাকবে। মোহাম্মদ সুলতান নামের লিস্ট তৈরি করেন। হালিমা স্কুলের মেয়েদের নিয়ে বের হল। প্রথম দু'টি দল গেল। আমি বের হয়ে ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করছি। তখন শুরু হল লাঠিচার্জ। ইতোমধ্যে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে পুলিশ। ইট ছোঁড়া চলল।

মেডিকেলের সামনে পৌঁছালে পুলিশের গুলিবর্ষণ শুরু হল। দিশা পাচ্ছিলাম না। দুটো বইয়ের দোকান ছিল। রেস্তোরার পেছন দিকে ডা. গণির বাড়ি। সেখানে গেলাম। সারা তৈফুর, সোফিয়া, সুরাইয়া, ডলি, শামছু এরা বসে আছে। এদিকে গুলি হচ্ছে। সন্ধ্যায় মুনীর চৌধুরী আমাদের হোস্টেলে পৌঁছে দেন।

এভাবেই ভাষা আন্দোলনে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন পর্দার আড়ালেই রয়ে গেলাম। ছেলেরা নিজেদের কথাটাই বলেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের নামে সড়কও হয়েছে। ভাষাসৈনিকদের নামে তেমন কিছুই হয়নি। সে সময়ে মেয়েরা চাঁদা তুলেছে। শুধু ঢাকাতেই নয়, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মেয়েরা আন্দোলন করেছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করতে গিয়ে যারা জেলে গিয়েছিলেন তাদেরও সম্মান দেয়া উচিত। ভাষার জন্য যুদ্ধ করেছি। ভাষা সঠিক না হলে জাতিসত্তা থাকবে না'– (*যুগান্তর* ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২)।

ভাষাসৈনিক রওশন আরা বাচ্চুর কথা– 'কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন পর্দার আড়ালেই রয়ে গেলাম।' বিষয়টা আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবজনক অধ্যায়। নারীপুরুষ নির্বিশেষে অমর একুশের ভাষাসৈনিকরা জাতির গর্বিত সন্তান একুশের ভাষাশহীদের মহিমাময় আত্মত্যাগ এবং ভাষাসৈনিকদের আন্দোলনের ফসলই আমাদের রাষ্ট্রভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। অথচ ভাষা আন্দোলনের ৬৩ বছর পরও আমরা অনেককে যথাযথ সম্মান দিতে পারিনি। আমাদের জাতির মননের প্রতীক বাংলা একাডেমিও ভাষাসৈনিক ও ভাষা-শহীদদের সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি ও জীবনী প্রকাশ করে জাতির সামনে তুলে ধরতে পারেনি। বিভিন্ন সময় ভাষাসৈনিকদের নিয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ হয়েছে সেগুলোও একত্রিত করা সম্ভব হয়নি। তারপরও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুস্তকে এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত এবং সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কতিপয় নারী ভাষাসৈনিকের জীবনগাথা তুলে আনা হলো।

ভাষা-শহীদ এবং ভাষাসৈনিকরা আজ শুধু বাঙালির বা বাংলাদেশীদের গর্ব নয়, সমগ্র বিশ্বের মাতৃভাষাপ্রেমী মানুষের গর্ব ও অহংকারের বিষয়। শুরুতে উদ্ধৃত ভাষাসৈনিক রওশন আরা বাচ্চুর মুখের কথা শুধু আক্ষেপ নয়, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরা জানি যে কোন আন্দোলন সংগ্রামে নারীদের সহযোগিতা, অংশগ্রহণ খুব সহসা সামনে আসে না, স্বভাববশত অন্তরালেই থেকে যায়। তাই নারী সংগ্রামীরা নিজেদের প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিতই হয়। অথচ তাদের যথাযথভাবে সম্মানিত করা এবং তাদের জীবন ও কর্ম জাতির সমানে তুলে ধরা আমাদের নাগরিক দায়িত্ব, নৈতিক দায়িত্ব।

এই প্রয়াসই বহুল প্রচারিত পুরুষ ভাষাসৈনিক নয় অপেক্ষাকৃত কম প্রচারিত নারী ভাষাসৈনিকদের পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যথাক্রমে– রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের গৌরবময়ী নারী, যাদের কথা আমাদের বলতে হবে– মাহফিল আরা আজমত (১৯২৯-১৯৯৩), চেমন আরা (১৯৩৫), রওশন আরা আসজাদ (১৯৩০), ড. সুফিয়া আহমদ (১৯৩২), শামসুন্নাহার আহসান (১৯৩২-১৯৮১), মনোয়ারা ইসলাম (১৯৩৬), অধ্যাপক কাজী জোহরা বেগম (১৯২২-২০০৭), বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), সোফিয়া খান (১৯২৮-২০০৮), আনোয়ারা খাতুন (১৯২৫), লিলি খান, ড. হালিমা খাতুন (১৯৯৩), ডা. কাজী খালেদা খাতুন (১৯৩৯), দৌলতুন নেসা (১৯২২-১৯৯৭), রাবেয়া খাতুন, ড. শরিফা খাতুন, ড. শাফিয়া খাতুন (১৯৩১), সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন, জাবেদা খানম চৌধুরী (১৯০১-১৯৮৬), সৈয়দা শাহার বানু চৌধুরী (১৯১৪-১৯৮৩), সারা তৈফুর, গুলে ফেরদৌস, রওশন আরা বাচ্চু (১৯৩২), নাদেরা বেগম (১৯২৯), মমতাজ বেগম (১৯২৩-১৯৬৭), হাজেরা মাহমুদ (১৯৩২-১৯৯৪), প্রতিভা মুৎসুদ্দি (১৯৩৫), লুৎফুন্নেসা (১৯৩০), শামসুন্নাহার, জুলেখা হক, কায়সার সিদ্দিকী, মরিয়ম খন্দকার তারা, সুরাইয়া কুলসুম, সেতারা, জুঁইফুল রায়, মোসলেমা, নুরুন্নাহার, জুলি এবং সাংবাদিক লায়লা সামাদসহ আরো অনেকে।

> **অমর একুশে ফেব্রুয়ারি**
>
> আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবের ইতিহাস, গৌরবের দিন। এখন এই গৌরবের ইতিহাস বিস্তার লাভ করেছে বিশ্ববাসী। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শুধু ভাষা আন্দোলনের শহীদ দিবস নয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসও। আন্তর্জাতিক এই স্বীকৃতি আমাদের ভাষা শহীদদের আত্মদানকে সম্মানিত করেছে, আমাদের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

ভাষাসৈনিক জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ ২০০০ সালে এক সাক্ষাৎকারে (সাক্ষাৎকার গ্রহণ, 'ভাষা আন্দোলন ও নারী' গ্রন্থের লেখক ফরিদা ইয়াসমিন) বলেন, 'বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে জড়ানোটা আকস্মিক কোন ঘটনা ছিল না। মাতৃভাষার মর্যাদা ও বাঙালি জাতির স্বকীয়তা ও স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে নিজের বিবেকের তাড়নায় অংশ নিয়েছিলাম। ... একুশে ফেব্রুয়ারির পর আমাদের আন্দোলনের কাজে আরও টাকা পয়সার দরকার হলো। আমরা চাঁদা তোলা শুরু করলাম।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা আদায় করতাম। আমাদের সঙ্গে সাংবাদিক লায়লা সামাদও থাকতেন। অনেক সাধারণ ঘরের মেয়েরা আঁচল থেকে পাঁচ টাকা খুলে দিয়েছে। ..... সে সময়ে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে প্রক্টরের অনুমতি নিয়ে কথা বলতে হতো, সে সময়ে আমরা রাস্তায় রাস্তায় আন্দোলন করেছি। পুলিশের মার খেয়েছি। ছোট ছোট কত মেয়ে যে মিছিল মিটিংয়ে এসেছে, আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে শামসুন্নাহার বোরখা পরেই আন্দোলন করতো। কিন্তু সেইসব মেয়ের কথা এই প্রজন্ম জানে না। তাদের কথা কি মানুষ জানবে না? তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাস্তায় আন্দোলনে নারী, এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি অতি বৈপ্লবিক ঘটনা। আমরা মেয়েরা ঝুঁকি নিয়ে প্রথম ১৪৪ ধারা ভেঙে ছিলাম। আমাদের যে কেউ সেদিন রফিক, বরকত, সালাম হতে পারত।'

মাহফিল আরা আজমত (১৯২৯-১৯৯৩): ভাষা সংগ্রামী মাহফিল আরা আজমত ১৯২৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের কক্সবাজার জেলার চকরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে কলকাতার কৃষ্ণনগর ক্রাইস্টচার্চ মিশনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৬ সালে লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৫০ সালে ইডেন মহিলা কলেজ থেকে বিএ এবং ১৯৫৩ সালে অর্থনীতি বিষয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (বিএড) এবং ১৯৫৬ সালে এমএড ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৫৩ সাল থেকে তিনি স্বামী আজমত উল্লাহর কর্মস্থল রাজশাহীর পিএন গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রাম নাসিরাবাদ গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি উক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করেন। তিনি সুদীর্ঘ ১৬ বছর অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনার পাশাপাশি ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৭-৮১ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৮১ সালে অসুস্থতার কারণে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে মাহফিল আরা আজমত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ভাষা আন্দোলন বিষয়ে জাগরণ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখেন। সিনিয়র ছাত্রী হিসেবে হলে ছাত্রীদের সংগঠিত হতে উৎসাহ দিতেন। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্রী ছিলেন।

একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে হয়েও তিনি মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভূমিকা পালন করেছেন তা ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়। এই মহিয়সী নারী ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং স্বাধীনচেতা। ছাত্র-ছাত্রী সবার অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তখন ভাষা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। তখন তাঁরা রাত জেগে পোস্টার লিখতেন ও স্লোগান তৈরি করতেন। পুলিশের টিয়ার গ্যাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মেয়েরা শাড়ির আঁচল পানিতে ভিজিয়ে নিতেন। পুলিশের আক্রমণে তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতেন, তারপর আবারও মিছিল নিয়ে অগ্রসর হতেন। তাদের শ্লোগান ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'নুরুল আমিন গদি ছাড়'। রফিক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পর সেই রক্তমাখা শার্ট ঝুলিয়ে রেখে তাঁরা মিছিলে যোগ দিতেন। শোককে শক্তিতে পরিণত করে শ্লোগান দিতেন সামনে এগিয়ে যেতেন।

সবকিছু উপেক্ষা করে তিনি আন্দোলনের পুরো সময়টাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটান, হলে অবস্থান করেন। সেই ফেব্রুয়ারিতে তাঁর বিয়ের তারিখ ধার্য করা হয়েছিল। এদিকে উত্তপ্ত সেই পরিস্থিতিতে হবু শ্বশুরবাড়িতে প্রচারিত হয়েছিল তাদের হবু পুত্রবধূ মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

আন্দোলন শেষে তিনি হল ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যান। তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতার কাজে সম্পৃক্ত থেকে নারীশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ভাষা আন্দোলনের এই সক্রিয় যোদ্ধা ১৯৯৩ সালের ১৭ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

চেমন আরা (১৯৩৫): ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের সময় চেমন আরা ইডেন কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্রী। তিনি বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তবে ১৯৪৮ সালে থেকেই 'তমদ্দুন মজলিস'-এর সাথে যুক্ত হয়ে এই আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক চেমন আরার জন্ম চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও থানার ঐতিহ্যবাহী মৌলবি বাড়িতে ১৯৩৫ সালের ১ জুলাই। তাঁর পিতা এ. এস. এম. মোফাখ্খর ছিলেন বিভাগ-পূর্ব কালে কলকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতিমান আইনজীবী, সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ। মাতা দুরদানা খাতুন ছিলেন একজন গৃহিনী। ১৯৫১ সালের ঢাকার সরকারি কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫৩ সালে ইডেন কলেজ থেকে ইন্টার মিডিয়েট পাশ করেন। পরবর্তী কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় ১৯৫৬ বিএ অনার্স ও ১৯৫৭ সালে এমএ পাশ করেন।

চেমন আরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অবদান রাখেন। তিনি নারী অধিকার আন্দোলনেরও একজন একনিষ্ঠ কর্মী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্র রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৫৪-৫৫ সালে ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ডাকসুর ম্যাগাজিন কমিটির মনোনীত সদস্য ছিলেন। কর্মজীবনে শত ব্যস্ততার মাঝেও নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। তাঁর স্বামী

বিশিষ্ট কথাশিল্পী শাহেদ আলী এবং বাবার কাছ থেকে এ বিষয়ে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে সাপ্তাহিক সৈনিক-এ প্রকাশিত হয় প্রথম গল্প। অধ্যাপকা চেমন আরার গল্প, স্মৃতিকথা, জীবনীগ্রন্থ ও কবিতার ৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং ৫টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ১৯৪৮ সালে থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রচুর গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছ। আজও লিখে যাচ্ছেন অবলীলায়।

নারায়গঞ্জের নবীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ঢাকা কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, তিতুমীর কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজ ও ইডেন কলেজে বাংলা বিভাগে প্রায় ৩৬ বছর অধ্যাপনা করেন। তিনি চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৩ সালে তিতুমীর কলেজ থেকে অবসর নেন। সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে কিছুদিন কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদীতে অবস্থিত ডা. আব্দুল মান্নান মহিলা কলেজ'র প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক আব্দুল কাসেমের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'তমদ্দুন মজলিস'। এ সময় অধ্যাপক কাসেম প্রায়ই চেমন আরার পিতা এ. এস. এম মোফাখ্খর এর সাথে পরামর্শ করতেন। সে সময় থেকেই কিশোরী চেমন আরার বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলনের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮ সালে চেমন আরা তমদ্দুন মজলিসের সাথে সাংগঠনিকভাবে জড়িত হন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক আহৃত সভা, সমাবেশ ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *সৈনিক* পত্রিকার প্রচার ও প্রসারে এবং বাংলা ভাষার দাবিতে পোস্টার লেখার কাজে তিনি সক্রিয় ছিলেন।

১৯৫০ সালে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক বিশিষ্ট সাহিত্যিক শাহেদ আলীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর ভাষা আন্দোলনের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা বহু গুণে বৃদ্ধি পায় এবং এ আন্দোলনের একজন সার্বক্ষণিক কর্মীরূপে আর্বিভূত হন। ভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার ১৯নং আজিমপুরের তিনি ছিলেন অন্যতম কর্মী। ১৯৪৯ সালে বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে লেখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সভা সমাবেশেও তিনি যোগদান করেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রীদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ইডেন কলেজের ছাত্রীদের সংগঠিত করে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে চেমন আরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমতলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ব্যাপারে যে সমাবেশ হয়, চেমন আরা সে সমাবেশে উপস্থিত থেকে ইডেন কলেজের ছাত্রীদের সংগঠিত করেন। সভাশেষে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা ঐতিহাসিক ছাত্রী মিছিলেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। ভাষা শহীদ বরকতের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি যে মিছিল বের হয় সে মিছিলে চেমন আরা অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে ভাষা আন্দোলনের চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ও লেখালেখির মাধ্যমে অবদান রাখেন।

ভাষা সংগ্রামী রওশন আরা আসজাদ ১৯৩৩ সালের ২৯ এপ্রিল নওগাঁ জেলার মল্লিকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী মকিম উদ্দিন আহমদ আর মাতার নাম ছালেহা বেগম। তিনি ১৯৪৮ সালে বরিশাল সদর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫০ সালে ইডেন কলেজ থেকে এইচএসসি, ১৯৫২ সালে অর্থনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাশ করেন। শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রামের রেলওয়ে স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে পাহাড়তলী নৈশ কলেজের প্রিন্সিপাল এবং পরে ১১ বছর চট্টগ্রামে রেলওয়ে পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং ঢাকার ইস্পাহানি স্কুল এণ্ড কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৪৮ সালের যে সভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিয়েছিলেন সে সভায় উপস্থিত ছিলেন স্কুলছাত্রী রওশন আরা। অন্য সকলের মতো একদিন তিনিও জিন্নাহর বক্তব্যে হতাশ হয়ে যান। শুরু হয় সারা দেশে প্রতিবাদ ও সভা সমাবেশ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত এসব সভা সমাবেশে রওশন আরা প্রায়ই যোগ দিতেন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের উত্তাল আন্দোলনের সময় রওশন আরা ইডেন কলেজে বিএ অধ্যয়নরত এবং থাকতেন কলেজের হোস্টেলে। কলেজের অন্য ছাত্রীদের সাথে প্রায় চলে আসতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়।

তিনি ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারির আগে ও পরের আন্দোলনের নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই হোস্টেল থেকে বের হয়ে পূর্ব নির্ধারিত আমতলার সভায় অংশগ্রহণের জন্য ছটফট করতেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কড়া নজরদারির কারণে হোস্টেল থেকে বের হতে পারছিলেন না। হোস্টেলে বসেই মিছিল আর গুলির শব্দ শুনতে পান। এমন পরিস্থিতিতে হোস্টেল সুপারের চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল বারবার। মিছিলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শেষে গুলির শব্দ। জুনিয়র মেয়েরা ক্ষণে ক্ষণে খবর দিচ্ছে গুলি

হচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে বোধ হয়। আর থাকতে পারলাম না। সুপার আপার চোখ এড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। সাথে ছিল মনোয়ারা মতি নামে একটি মেয়ে এবং আরো একজন। গেটে তালা মেরে দারোয়ান বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তাই মাঠের প্রান্তে অবস্থিত ইকবাল হলের সুপারের বাসার বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। সোজা প্রাদেশিক পরিষদের মোড়ে। জনসমাগম প্রচুর। ছাত্র ছাড়াও সাধারণ লোক ছিল। টিয়ার গ্যাসের সেল পড়েছে মহুর্মুহু। শহীদের রক্তে ভেজা শার্টের ছেঁড়া টুকরা লাঠির আগায় বেঁধে তুলে ধরা হয়েছিল, আমার সামনে টিয়ার গ্যাসের সেল এসে পড়ে ফেটে গেল। চোখ জ্বালা করছিল। মেডিকেল কলেজে বসলাম। দেখেছি বাঁশের বেড়ায় গুলির আঘাতে সৃষ্ট ফুটা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত ও ভাষা শহীদের লাশ আগেই আনা হয়েছে, তাদের দেখতে যেয়ে বাধা পেলাম। অনেক লোককে হাসপাতালের বিছানায় দেখেছি। একজন নার্স বললেন, অনেক লোক মারা গিয়েছে। পুলিশ 'ডেড বডি' নিয়ে যাচ্ছে।'

ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছেন। রওশন আরার বাবা তখন সরকারি চাকুরি করতেন। তবু তাঁকে এ আন্দোলনের যেতে বাধা প্রদান করেননি। তাঁর ছোট ভাই তখন সুনামগঞ্জ সরকারি স্কুলের ছাত্র। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে পুলিশের খাতায় তাঁর নাম সংযুক্ত হয়েছিল। ভাষাসৈনিক রওশন আরা আসজাদ বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা জাতীয় অধ্যাপক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন ভাষাসৈনিক ড. সুফিয়া আহমদ (১৯৩২)। তিনি ১৯৩২ সালের ২০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মোহাম্মদ ইব্রাহিম ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ছিলেন। মাতা লুৎফুন্নেছা ইব্রাহিম ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক আর্দশ ও বিদুষী নারী। স্বামী ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ ছিলেন দেশের প্রখ্যাত আইনজীবী এবং একজন ভাষা সংগ্রামী।

সুফিয়া আহমদ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার্স স্কুলে এবং দার্জিলিং-এর ডাউহিল স্কুলে। দেশ বিভাগের পর প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় তৎকালীন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম দশজনের মধ্যে মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেন। তিনি ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ হতে স্নাতক এবং ১৯৫৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিলাভ করেন। ১৯৬০ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমদের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৮৩ সালে বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

১৯৮৪ সালের অক্টোবর হতে ১৯৮৫ সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে 'বসফোরাস বিশ্ববিদ্যালয়'-এ ভিজিটিং প্রফেসর এবং ১৯৮৫ সালের আগস্ট হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Wisconsin স্টেটের Miwaukee শহরে অবস্থিত Alvero College এ visiting professor হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ সালে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে মনোনয়ন প্রাপ্ত হন।

এই মহিয়সী নারী একুশে পদকসহ তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশ বিদেশে অনেক সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত হন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ ড. সুফিয়া আহমদের জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৪৮ সালে কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় বাংলা ভাষার প্রতি সৃষ্টি হয় গভীর অনুরাগ।

১৯৫০ সালে ভর্তি হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। হোস্টেলে না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সে সুবাদেই সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে মেয়েদের মধ্যে সুফিয়া আহমদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যেসব মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোতে তিনি যোগদান করেছেন এবং অনেক সময় বক্তৃতা করেছেন জোরালো ভাষায়। এসময় ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের সংগঠিত করার দায়িত্বও পালন করেন তিনি।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে ঐতিহাসিক আমতলায় অনুষ্ঠিত ছাত্রজনতার সমাবেশে সুফিয়া আহমদ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সমাবেশ থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত হলে মেয়েদের যে দলটি প্রথম বের হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সুফিয়া আহমদ সেদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে পুলিশ কর্তৃক লাঠির ব্যারিকেড দেয়া ছিল। তাঁদের দলটি সেই ব্যারিকেড ভেঙে অগ্রসর হয় এসময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ও লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠির আঘাতে সুফিয়া আহমদ আহত হন। টিয়ার গ্যাসের ঝাঁজে ছটফট করতে থাকেন। তখন পুরো এলাকা ছিল রণক্ষেত্র। এসময় কোনে রকমে তৎকালীন সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ড. ওসমান গণির বাসার আশ্রয় নেন তিনি। এ অবস্থায় আবারও মেডিকেল কলেজের দিকে যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে শুরু হল গোলাগুলি।

ভাষার জন্য শহীদ হলেন কয়েকজন তরুণ। সৃষ্টি হল এক অমর ইতিহাস। এসব ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও সংগ্রামের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন সুফিয়া আহমদ।

সেদিন বিকেলে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে সদস্য আনোয়ারা খাতুনের বক্তৃতায় সুফিয়া আহমদের উপর পুলিশের হামলার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ পায়। একুশের ঘটনার পর ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সুফিয়া আহমদ সাংবাদিক লায়লা সামাদসহ বেশ কয়েকজন মেয়ে ভাষা আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ করেছেন। তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছেন। এভাবে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কাজে তিনি আত্মনিবেদন করেছেন। ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ধানমন্ডিতে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে 'ভাষাসৈনিক সুফিয়া আহমদ সড়ক'।

শামসুন নাহার আহসান ১৯৩২ সালে বরিশালে এক রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব আবদুল ওয়াহাব খান। তিনি নারীশিক্ষায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। শামসুন নাহার ছোটবেলা থেকেই অতীব মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৫০ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকার ইডেন কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন কর্মজীবন শুরু করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় শামসুন নাহার আহসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। সে বছরের জানুয়ারি মাসের ২৭ তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকা পল্টন ময়দান এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করলে দেশের বাংলাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে শামসুন নাহার আহসান প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বোরখা পরে ভাষা আন্দোলনের সমাবেশ ও মিছিলে যোগদান করেছেন।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে আন্দোলন শুরু করেছিল, শামসুননাহার আহসান শুরু থেকেই সে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন নিজের অন্তর্গত তাড়না থেকে। তিনি সে সময় তার সহপাঠীদের নিয়ে প্রায় সব ছাত্রসভা, মিছিল ও পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করেছেন। তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিজে চাঁদা দিয়েছেন, অন্যদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে আন্দোলনের তহবিল সমৃদ্ধ করেছেন, আন্দোলনে শক্তি যুগিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী নিবাস 'চামেলি হাউজে' ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি বাস্তবায়নে করণীয় ঠিক করতে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেসব সভায়/সমাবেশে শামসুননাহার আহসান অংশগ্রহণ করেছেন, বক্তব্য রেখেছেন, নিজে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে ছাত্রীদের করণীয় ঠিক করেছেন। চামেলি হাউজের নারীদের সংগঠিত করে আন্দোলনে শরিক করার জন্য ড. শাফিয়া খাতুনের সাথে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে শামসুননাহার আহসান অন্যতম।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রজনতার সমাবেশকে সফল করার জন্য ছাত্রীরা এগিয়ে এসেছিল। সেই মহাসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন শামসুননাহার আহসান। একুশে ফেব্রুয়ারির ওই সমাবেশ সফল করে তোলার জন্য তাঁরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন গালর্স স্কুলে গিয়ে মেয়েদের সংগঠিত করে নিয়ে আসেন। এভাবে তিনি আমতলার ছাত্র জনতার সমাবেশে ছাত্রীদের সমবেত করার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। আমতলার সমাবেশে অন্যান্য ছাত্রীদের সাথে তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

আমতলার সমাবেশ থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত হলে শামসুননাহার আহসান একটি গ্রুপের সাথে উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বান্ধবীদের সাথে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বের হয়ে আসেন। এক পর্যায়ে পুলিশ মারমুখী হয়ে ওঠে। পুলিশের টিয়ার গ্যাস ও লাঠিপেটার মধ্যে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন শামসুননাহার আহসান, পরিষদ ভবনের কাছে এগিয়ে যেতে থাকেন। এক পর্যায়ে তাঁদের দলের কয়েকটি মেয়ে পুলিশের লাঠির আঘাতে আহন হন। তাঁরা পাশে একটি কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ড. গণির বাসায় আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় কাঁটা তারের বেড়ায় আটকা পড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় তাঁর শরীর। ২২ ফেব্রুয়ারি গায়েরী জানাজা শেষে যে মিছিল হয় তাতে শামসুননাহার অংশগ্রহণ করেন।

২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে যেসব মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে সেগুলোতে শামসুননাহার আহসান অংশগ্রহণ করেছেন। পুলিশের রক্তচক্ষু কিংবা গ্রেফতারের ভয় তাঁকে কখনও আদর্শচ্যুত করতে পারেনি।

ভাষা সংগ্রামী মনোয়ারা ইসলাম ১৯৩৬ সালের ৬ মে তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মির্জা ইব্রাহিম হোসেন এবং মাতার নাম বেগম নুরুন্নেছা খাতুন। তিনি ১৯৪৮ সালে মাদারীপুর ডোনোবান হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫০ সালে

ইডেন মহিলা কলেজ থেকে এইচএসসি, ১৯৫২ সালে একই কলেজ থেকে বিএ (স্নাতক ডিগ্রি) এবং ১৯৫৫ সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাশ করেন। ১৯৫৬ সালে বিএড এবং ১৯৬২ সালে এমএড ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫৭ সলে আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন মনোয়ারা ইসলাম। ১৯৬৭ সালে যোগদান করেন গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে ১৯৯৭ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পরে কিছুদিন বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে অধ্যাপনা করেন। এছাড়াও নানাবিধ সমাজসেবামূলক কাজে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত তৎকালীন বিভিন্ন সভায় যোগদান করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের বাধা উপেক্ষা করে দেয়াল টপকিয়ে চলে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রহত্যার খবর শুনে সাথে সাথেই চলে আসেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গণে।

একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে যোগদান করেন আন্দোলনের নানা কর্মসূচিতে। ইডেন কলেজের তৎকালীন হোস্টেল সুপার হালিমা খাতুন তাঁকে বার বার নিষেধ করেন মিছিলে যেতে। বাবার সরকারি চাকরি হারবার ভয় এবং শিক্ষকদের আদেশ তুচ্ছ জ্ঞান করে তিনি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় হোস্টেলের পিয়ন এসে বলল, রাস্তায় অনেক গণ্ডগোল হচ্ছে। পরে এসে খবর দিল গুলি হয়েছে, অনেক লোক মারা গেছে। আমরা চমকে গেলাম। সে যুগে গুলি করে মানুষ মারার ঘটনা বিরল। আরো খবর এল মেডিকেল হাসপাতালে বহু লাশ নেওয়া হয়েছে। হোস্টেলের সুপার গেটে তালা লাগানোর হুকুম দিলেন। আমরা বাইরে যাওয়ার জন্যে বিচলিত হলাম। এর আগেও ক্লাস পালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় মিটিং শুনতে গেছি। তখনই বুঝতে পারছিলাম বাঙালিদের জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। হোস্টেলের ভাঙা পাঁচিলের ভেতর দিয়ে বের হয়ে আমরা– আমি, দুলু, মতি এবং আর একজন নাম মনে করতে পারছি না ঠিক এই মুর্হূতে খুব সম্ভব শরিফা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাই। হাসপাতালের বিছানায় কিশোর বয়সের ছেলেরা, স্কুলের ছাত্ররা সব টিয়ার গ্যাসে আহত হয়ে শুয়ে আছে। ঘরের এক কোনায় দেখলাম ডাক্তার এবং নার্সরা ব্যস্ত হয়ে কি করছে। একটু কাছে গিয়ে দেখলাম একজন রোগীকে নিয়ে ব্যস্ততা। আমাদের ওখান থেকে চলে যেতে বলা হয়। পরে শুনছিলাম ওটাই ছিল বরকত। একুশে ফেব্রুয়ারিতে গুলি হওয়ার পর ২৩ তারিখ সকালে আমরা আবার পাঁচিলের ফোকর গলে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে যাই।

'ওই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা জেলখানায় থাকে। আমরা হোস্টেলের মেয়েরা একদিন সকালের নাশতার পয়সা বাঁচিয়ে ছাত্রদের জন্য ডিম সিদ্ধ, পাউরুটি, মাখন, জেলি নিয়ে যাই জেলখানায়। গুলি চলার চার পাঁচদিন পর একদিন আমরা হোস্টেলের মেয়েরা বিকেলে মাঠে ঘোরাফেরা করছি, কেউ কেউ ব্যাডমিন্টন খেলছে, হঠাৎ দেখি গেটের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা ছেলে আমাদের ডাকছে। ছুটে গেলাম গেটের কাছে। গেট যথারীতি তালাবদ্ধ। ছেলেটা একটা প্যাকেট দেখিয়ে বলল, সে এসএম হলের ছাত্র। প্যাকেটটায় একটা মাইকের যন্ত্রাংশ আছে। হলে তল্লাশি হবে তাই বিভিন্ন জায়গায় এগুলো সরিয়ে ফেলছে। আমরা যদি এগুলো লুকিয়ে রাখি উপকার হবে। নির্বিবাদে নিয়ে নিলাম। ছেলেটা আরো বললো, যদি আমাদের হলেও তল্লাশি চলে অথবা তিন চার দিনের মধ্যে কেউ না নিতে আসে তবে আমরা যেন পুকুরে ফেলে দিই। হোস্টেলের মধ্যে একটা বড় পুকুর ছিল। আমরা প্যাকেটটা মাঠের এক পাশে বড় একটা আম গাছের গোড়ায় শুকনো পাতার স্তূপের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলাম। মাঠে খেলার সময় বা অন্য সময়ও আমাদের নজর থাকত ওই শুকনো পাতার স্তূপের দিকে। তিন দিন পর ঠিকই ছেলেটা এসে প্যাকেটটা নিয়ে যায়। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা চাঁদা তুলেছিলাম। আমরা ইডেন কলেজের মেয়েরা তখন যে কাজগুলো করেছিলাম, ভাষা আন্দোলনে তার অবদান রয়েছে বৈকি। তখনকার সময়ে কড়া বিধি নিষেধের মধ্যে থেকেও আমরা ইডেন কলেজের ছাত্রীরা যেটুকু করেছিলাম আন্তরিকভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করেছিলাম। সামাজিক সেই পরিবেশ কলেজ এবং হোস্টেলের কড়া প্রহরার মধ্যেও ভাষা আন্দোলনের জন্য মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের সঙ্গে যে একাত্মতাবোধ করেছিলাম, কর্তৃপক্ষের রক্ষচক্ষুকে উপেক্ষা করে, ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা চিন্তা না করে, নির্ভয়ে যতখানি এগিয়ে গিয়ে ছিলাম তার মূল্য আমাদের জীবনে অনেক। পরবর্তী সময় সেদিনের কথা ভেবে আত্মতৃপ্তি পেয়েছি, গর্বিত বোধ করেছি।'

**শাওয়াল খান**
গবেষক ও কথাসাহিত্যিক

**তথ্যসূত্র:**

১. *প্রতিবুদ্ধিজীবী:* ১৩, ভাষাসৈনিক সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১০

২. *ভাষা আন্দোলন ও নারী*, ফরিদা ইয়াসমিন

শ ফি আ হ মে দ

# একুশ ও অসাম্প্রদায়িকতা

একুশে ফেব্রুয়ারি, শহীদ দিবস, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন। একটা অমর গৌরবময় দিবসকে ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে আমরা বিভিন্নমুখী আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, প্রধানত ফেব্রুয়ারি মাসের একুশ তারিখকে উপলক্ষ করে এবং আর একটু ব্যাপকভাবে সারা মাসটা জুড়ে। বারে বারে আমরা স্মরণে আনতে চাই যে, একটি বিশেষ তারিখে ভাষার দাবিতে আন্দোলন দমন করার জন্য পাকিস্তানী শাসকবৃন্দের আদেশে পুলিশ গুলি করে কয়েকজনকে হত্যা করেছিল বটে, কিন্তু এই আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিল যথেষ্ট আগে। এমনকি তার ঠিক আগের বছর অথবা আরো আগের বছরে নয়। বাংলা ভাষাকে তার মর্যাদাপূর্ণ আসন থেকে বিচ্যুত করার একটা গভীর আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানী সরকারের। তারা সেকথা প্রকাশ্যে বলেও

বেড়িয়েছিল। তাদের পরিকল্পনার মধ্যে বোধ করি এমন একটা ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল যে, ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হবার পর ইসলাম ধর্মাবলম্বী পূর্ব বাংলার নাগরিকদের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানই একমাত্র ভরসার স্থল। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবেই বাঙালিরা কোন অবস্থান গ্রহণ করবে না।

এই আলোচনা অনেক দীর্ঘ, তার মালমসলা গবেষণার বিষয়। আমি সহজ এবং সাধারণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে চাই। সেই ১৯৫২ সালের অমন রক্তমাখা দিনের পর থেকেই আমরা এই দিবসে সংঘটিত একই সঙ্গে বেদনাময় ও গৌরবময় ঘটনার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলো বিষয়ের অবতারণা করি। রাজনীতিকরা এর মধ্য দিয়ে একটা বার্তা পেয়ে গিয়েছিলেন। এবং তাঁরা সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের আলাদা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। চিন্তার দিক থেকে অগ্রবর্তী এবং প্রগতিশীল নেতারা সেই দিক থেকেই অনেক কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন। দেশের সাধারণ শিক্ষাবঞ্চিত মানুষ যাঁরা এই কিছুদিন আগেই ধর্মের ষাঁড়ের পিঠে চেপে 'পাকিস্তান বানিয়েই ছাড়ব,' এমন আন্দোলনের প্রতি সরব সমর্থন দিয়েছিলেন, তারা আধা বুঝে অথবা আধা না বুঝে একটু বিচলিত কিংবা আহত বোধ করেছিলেন।

রাজনীতিকদের মধ্যে অনেকের ভাবনায় তখন শুধুই নতুন দেশ গড়ার চেয়ে উপভোগ করার প্রবৃত্তি বেশি ছিল। তাই একুশের বা ভাষার ওই আন্দোলনের সময়ও আমাদের সমাজে চিন্তা-চেতনা, প্রচারণা ও কর্মে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক রাজাকার ছিল। ঠিক একাত্তরের রাজাকারের মতই তাদের ভাবনার ও সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্মের প্রধান বিন্দুতে ছিল ভারত-বিরোধিতা। পাকিস্তানী শাসকদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও ভোগ করার মধ্যে এমন একটা প্রকাশ্য কৌশল ছিল। পাকিস্তান প্রেম কিভাবে জাগ্রত করা যায় অথবা নিখিল পাকিস্তানের মধ্যে কিভাবে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করা যায় তা নিয়ে পাকিস্তানী সরকারের কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল না। হাজার মাইল দূরের দুই প্রদেশের মানুষ যারা ভাষা, বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রকাশভঙ্গি আচার আচরণ, ভূগোল ইতিহাস ইত্যাদি বহু

বিষয়ের বিচারেই একে অপরের থেকে পৃথক এবং অনেকটা অচেনা, তাদের মেলবন্ধনটা কিভাবে সদর্থকভাবে হতে পারে, তা নিয়ে কোন ভাবনা বা উদ্যোগের কথা আমরা জানি না।

অনেক পরে আইয়ুবী আমলে সরকারের পক্ষ থেকে আমলাতান্ত্রিক কিছু প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ততদিনে পদ্মা ও বিপাশায় অনেক জল গড়িয়েছে, জলপ্রবাহের অভাবে কোথাও কোথাও চর জেগেছে। আবার প্রবাহ যেখানে ক্ষীণ হলেও ছিল, সেখানে স্রোতের টানে অনেক নোংরা আর্বজনা ঢুকে পড়েছে। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে কোন কার্যকর মৈত্রী স্থাপনে সেই স্রোতকে পরিশোধনের আর কোন উপায় নেই তখন। পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ 'ইসলাম পসন্দ' মনোবৃত্তিকে ভারত-বিরোধিতার সঙ্গে একাকার এবং অবিভাজ্য করেই ক্ষান্ত হননি, তাদের বিচারে শুধু ধর্মানুগর্ত্যের সত্য অন্য অনেক বাস্তবতাকে বেমালুম গৌণ করে দিতে পারে, এমন একটা বিশ্বাস দৃঢ়তা পেয়েছিল।

বিষয়টার মধ্যে যতটা কৌশল ছিল, তার অর্ধেক পরিমাণ নৈতিকতা ছিল না। এই কর্মসূচি যদি সফল না হয়, তা হলে উদ্দেশ্য সাধনে বিকল্প কি পন্থা গ্রহণ করা যায়, তেমন সংশোধনবাদী কোন প্রক্রিয়ার চেয়ে ভারতের কোন কল্পিত ভূমিকা শনাক্ত করা বা দমননীতির দ্বারস্থ হওয়া অনেক কার্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ঠিক তাদের সুরে সুর মেলানোর কিছু লোক কিন্তু আমাদের সমাজে তখনই ছিল, ঠিক ওই একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের কালে রাজাকারদের তৎপরতার সঙ্গে যাদের তুলনা করা যায়।

এবং এ ব্যাপারটা তখন অস্বাভাবিকও ছিল না। মাত্রই ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছে। বাস্তব অর্থে মুসলিম লীগের পক্ষে শক্তি প্রদর্শন করার লোকজনের তো অভাব হবার কথা নয়। সাধারণ মানুষ, যাঁরা রাজনীতির ক্ষমতার সড়ক বা চোরাগলি চেনেন না বা তাদের চেনার কোন আগ্রহই নেই, তারা জানে যে, মুসলমান হিসেবে তারা একটা সুনিশ্চিত ঠিকানা হয়েছে এবং এই ঠিকানাকে নিরাপদ রাখা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, যদিও কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে তাদের কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পড়েছেন, তারাও এ বিষয়ে তৎকালীন মানুষের সরল প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটা বাস্তব চিত্র পেতে পারেন। তারা ভেবেছিলেন, মুসলমানদের জন্য একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের জন্য ভালো হবে, তাদের আয় ও উন্নতি হবে। হিন্দুদের আধিপত্যের কারণে যেটা ভারতীয় কাঠামোর মধ্যে সম্ভব হচ্ছিল না। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য এই যে যুক্তি বা রাজনৈতিক ফতোয়া তাতে যারা বিশ্বাস রেখেছিলেন, তার সিংহভাগই ছিল সাধারণ শিক্ষাবঞ্চিত মানুষ। এটাকে মূলধন করেই ভাষা আন্দোলন দমন করার জন্য পাকিস্তান একটা যুক্তি উপস্থাপন করেছিল। এটাকে কুযুক্তি বা প্রতারণা কৌশল বলাই ভাল। ব্যাপারটা খুব সোজা সাপটা। এবং ওই একই যুক্তি আরো প্রবলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতেও।

বলা হয়েছিল, ভাষা আন্দোলনের নামে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার যে দাবি নিয়ে ঢাকার রাজপথ উত্তাল হয়ে ওঠেছে, তার সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্ব অংশের সাধারণ বাংলাভাষী ঈমানদার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল জনগণের কোন যোগ নেই। আন্দোলনের নামে যা চলছে তা হলো পাকিস্তান রাষ্ট্রে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজের উর্দু ভাষার প্রতি কোন বিরূপ মনোভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামে বিশ্বাসী পাকিস্তানী মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করার জন্য তাদের আলাদা ভাষাগত পরিচয় থাকা উচিত। এবং সেটা হবে এমন একটা ভাষা যা পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অধিকতর ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করবে। এক্ষেত্রে উর্দু ভাষার কোন বিকল্প নেই। কারণ, উর্দু ভাষার সঙ্গে ভারতের পূর্বতন মুসলিম শাসক গোষ্ঠীর মূলগত যোগ রয়েছে। এই ভাষাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় ইসলাম সম্মত ভূমিকা পালন করতে পারবে।

অন্য দিকে, বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তন ঘটেছে ভারতীয় হিন্দুদের ভাষা সংস্কৃত থেকে। এই ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে তা ইসলামী সংস্কৃতির প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে না। পাকিস্তান একটি অখণ্ড রাষ্ট্র এবং সেজন্য তার একটা অদ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষাও থাকতে হবে। এদেশে যদি বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটে এবং তা যদি পাকিস্তানের পূর্ব অংশের সংস্কৃতি নির্মাণের বাহন হয়ে ওঠে, তা হলে ইসলামী চিন্তাভাবনা এমনকি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

একথা স্মরণে রাখতে হবে যে, ভারত আমাদের শত্রুরাষ্ট্র, সেই দেশ কোনভাবেই আমাদের কল্যাণ কামনা করতে পারে না। উপরন্তু ভারত সর্বদাই আমাদের ক্ষতি ও বিনাশের পক্ষপাতী। যদি বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচার ঘটে এবং তার ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে, তার সুফল চলে যাবে ভারতের কাছে। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, ভারতের সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ উল্লেখযোগ্য অংশের অধিবাসীদের ব্যবহৃত ভাষা হল বাংলা। বাংলা ভাষার প্রচলন বৃদ্ধি পেলে বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় বা হিন্দুদের সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্ব অংশের বাঙালিদের সম্পর্ক ও যোগাযোগও বৃদ্ধি পাবার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে এবং বলা বাহুল্য পরিণতিতে তা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের বিপরীতে বাংলা ভাষার

জন্য আন্দোলনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া পাকিস্তান সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এই আন্দোলনের সঙ্গে পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী মুসলমানদের কোন যোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে, ওই অঞ্চলের হিন্দু সমাজ এবং ভারতের নিয়োজিত কিছু চর পূর্ব বাংলায় অবস্থান করছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রকে দুর্বল করার জন্য এই চরেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ভারত পন্থী শিক্ষকদের সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগ তৈরি করে। এবং যাঁরা তথাকথিত নাস্তিকতাবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত তারাই এই আন্দোলন সংগঠিত করছে। শেষ বিচারে, এই ভাষা আন্দোলন কিন্তু হিন্দু-জনগোষ্ঠী পরিচালিত এবং তারা তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে চায়। পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে অবহিত এবং রাষ্ট্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

নানান আলোচনার মধ্যে আমরা বিশেষ কিছু এলাকা চিহ্নিত করতে পারি। ভাষা আন্দোলন কিভাবে আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনকে বেগবান করে তুললো, কিভাবে এই আন্দোলন আমাদের আত্মপরিচয় উদঘাটনে সহায়তা করলো, আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও পরিপুষ্টি কিভাবে ঘটলো, বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা কিভাবে আমাদের নিজস্বতাকে জাহির করতে পারলাম ইত্যাদি এবং পরিশেষে বায়ান্ন কিভাবে আমাদেরকে একাত্তরের পথে চালিত করলো, একুশ বিষয়ে আলোচনায় এমন সব প্রাসঙ্গিক ও বিভিন্নমুখী দৃষ্টিকোণ প্রাধান্য পায়। কিন্তু একুশ কিভাবে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার জাগরণ ও পরিপালনে আমাদের যুগপৎ হৃদয়জাত এবং বৃদ্ধিবৃত্তিক অগ্রযাত্রায় নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল, সেকথাটাকে অবহেলা না করলেও তার সঠিক বিশ্লেষণে আমরা যথাযথ মনোযোগ প্রদান করিনি।

অন্যদিক থেকে একুশের আন্দোলনকে সমীক্ষণ ও একই সঙ্গে দমন করার জন্য পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ যে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-বিরোধিতাকে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিল, সেকথার ওপরও আমরা যথেষ্ট জোর দিইনি। সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করার জন্য অথবা নির্মূল করার জন্য বঙ্গবন্ধু স্বাধীন জাতির সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর আবার আমাদের সংবিধানে ইসলামী প্রবন্ধন দেখা গেল এবং চতুর বুদ্ধিজৈবিক কৌশলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে কর্তন করা হল। এই সবটা প্রক্রিয়ার মধ্যেই কিন্তু পাকিস্তানপ্রবণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব কাজ করেছে।

অন্যদিক থেকে একুশের আন্দোলনকে সমীক্ষণ ও একই সঙ্গে দমন করার জন্য পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ যে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-বিরোধিতাকে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিল, সেকথার ওপরও আমরা যথেষ্ট জোর দিইনি। সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করার জন্য অথবা নির্মূল করার জন্য বঙ্গবন্ধু স্বাধীন জাতির সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর আবার আমাদের সংবিধানে ইসলামী প্রবন্ধন দেখা গেল এবং চতুর বুদ্ধিজৈবিক কৌশলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে কর্তন করা হল। এই সবটা প্রক্রিয়ার মধ্যেই কিন্তু পাকিস্তানপ্রবণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব কাজ করেছে।

অনেকে একথা জেনেও তা এড়িয়ে যান। ধর্মজীবী ইসলামিক রাজনৈতিক দলসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কথা বলে সুস্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িকতার পক্ষ অবলম্বন করেন। এই সমকালে যেভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরুত্থান দেখা যাচ্ছে, যেভাবে ধর্মভিত্তিক শিক্ষালয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেভাবে হেফাজতের শক্তির প্রদর্শনী দেখা যাচ্ছে, তাতে বাংলা কাফেরের না হোক, ঈমানদার মুসলমানের ভাষা নয়, নাতিদূর ভবিষ্যতে এমন বিবৃতির আশঙ্কাকে অমূলক মনে হয় না আমার।

আমরা কোন ভাষার বিরোধী নই, কিন্তু যখন অকারণে বাংলা ভাষার মধ্যে ভিনদেশী ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে তা আমার মায়ের ভাষাকে দুর্বল করে দেয়। কিছু কিছু ব্যাংককে এমনকি ইউরোপীয় মালিকানাধীন ব্যাংকেও হিসাব খোলার জন্য বিদেশী ভাষার ইসলামী নাম ব্যবহার করা হচ্ছে, যে শব্দের সঙ্গে বাংলা ভাষার ও বাংলাভাষীর কোন পরিচয় বা ভাবগত সন্ধি নেই। এসবের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে ইসলামী আধিপত্য বিস্তারের প্ররোচনা দেখতে পাওয়া যায়।

একুশ যেন সাম্প্রদায়িকতা বিতাড়নে আমাদের মধ্যে সেই বায়ান্নর চৈতন্য এনে দেয়, এই ফেব্রুয়ারিতে এই আমাদের পরম কামনা।

**শফি আহমেদ**
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জি য়া উ ল হা সা ন

# বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রসঙ্গ

প্রমিত উচ্চারণ বলতে কী বোঝায়, এ উচ্চারণরীতিতে কথা বলা আমাদের জন্য আবশ্যক কেন, প্রশ্ন দু'টির উত্তর খোঁজার প্রাক্কালে আমাদের জেনে রাখা ভালো যে, বাংলা ভাষার লিখিত রূপ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণে নির্মিত এবং উচ্চারিত রূপ প্রাকৃত বাংলা ভাষার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী গঠিত। যেমন 'শিক্ষা' শব্দটির লিখিত রূপ হল: শ্+ই+ক্+ষ্+আ= শিক্ষা; এরূপ 'বিজ্ঞান' শব্দের লিখিত রূপ হল: ব্+ই+জ্+ঞ+আ+ন=বিজ্ঞান। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'শিক্ষা' ও 'বিজ্ঞান'-এর লিখিত রূপ যা তা উচ্চারণ করলে দাঁড়ায় 'শিক্ষা' ও 'বিজঞান'। কিন্তু হিন্দিতে এই সংস্কৃত শব্দ দু'টির উচ্চারণ হুবহু এর লিখিত রূপের ন্যায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান হলেও বাংলায় তা নয়। মূল ব্যাকরণের বাংলায় এর উচ্চারিত রূপ নিয়ম অনুযায়ী হল: শিক্ষা ও বিগ্‌গ্যাঁন।

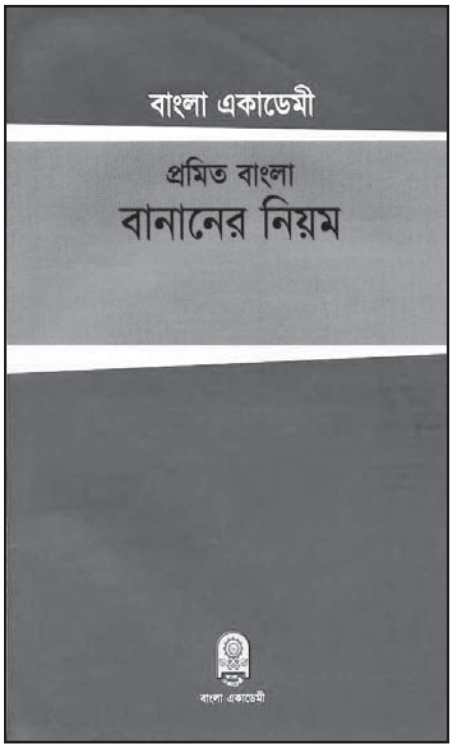


যুক্তাক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত হয়নি এমন দু'টি সহজ, শব্দকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন: 'অভিনয়', 'হলুদ'। উভয় শব্দের আদিতে 'অ' আছে। যেমন: অ+ভ+ই+ন+অ+য়্= অভিনয় এবং হ+অ+ল+উ+দ্। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণে শব্দ দু'টি লিখিত হলেও এর উচ্চারিত রূপ হল: অভিনয়- ওভিনয় এবং হলুদ- হোলুদ। অর্থাৎ এদের আদিতে যে স্বরধ্বনি (অ) আছে, তা উচ্চারিত রূপে ও-কারান্ত হয় প্রাকৃত বাংলা ব্যাকরণের উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী। 'এক' শব্দটির লিখিত রূপ যাই হোক না কেন উচ্চারিত রূপ কিন্তু 'এ্যাক'। সুতরাং শিশুকাল থেকেই বাংলা ভাষার (ধ্বনি/বর্ণ, শব্দ, বাক্য) লিখিত রূপের চর্চা যেমন আমাদের নিয়মিত করতে হয়েছে, তেমনি উচ্চারিত রূপের চর্চা করাও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা হয়নি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কিংবা উচ্চ শ্রেণির কোথাও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠদান কালে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ উচ্চারণ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা শিক্ষকবৃন্দ নিজেদের অক্ষমতাকে ঢেকে রাখার জন্য বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রমিত উচ্চারণের পিছিয়ে পড়েছে। আশার কথা এই যে, আজকাল অনেকেই বিশুদ্ধ উচ্চারণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক উদ্যোগে চর্চা প্রবণতা এমন করেছে।

আমাদের দেশে বাংলা ভাষার উচ্চারিত রূপ পাওয়া যায় প্রধানত দু'টি- ১. প্রমিত (মান্য কথ্য বাংলা) ও ২. আঞ্চলিক (জেলা বা অঞ্চলভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন ভাষা)। প্রমিত বাংলা উচ্চারণ হল শিক্ষিত বাঙালির সাধারণ কথোপকথনে ব্যবহৃত আঞ্চলিকতামুক্ত উচ্চারণ। এই উচ্চারণ অধিক পরিশীলিতভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে আবৃত্তি, নাটক এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক নানা অনুষ্ঠানে। যেমন: 'এই কবিতাটি এতবার পড়েও বুঝতে পারলাম না।' বাক্যটি আরও একটু পরিশীলিতভাবে এমন করে বলা যেতে পারে, 'এ কবিতাটি পড়েছি বহুবার, কিন্তু পুরোপুরি বোধগম্য হয়নি।' দু'টি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু সামান্য-শব্দ ব্যবহারে ও প্রমিত উচ্চারণে। আমি নিঃসন্দেহ যে, দ্বিতীয় বাক্যটি উচ্চারণে অধিক শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের শব্দ সংযোগ ও তার যথার্থ উচ্চারণ সাধারণত অনুষ্ঠান, সভা-সম্মেলন কিংবা গণমাধ্যমে প্রচারকালে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিরলস নিরবচ্ছিন্ন চর্চা দ্বারা তা অনায়াসে আয়ত্ত করা সম্ভব।

আঞ্চলিক বাংলা ভাষা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা বা অঞ্চলে

স্থানীয় সাধারণ মানুষের মুখে মুখে হরহামেশাই উচ্চারিত হয়। অঞ্চলভিত্তিক এই ভাষার মধ্যে উচ্চারিত রূপেও রয়েছে ভিন্নতা। যেমন: 'চলে যাব' শব্দ দুটি দিয়ে গঠিত বাক্যটি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারিত হয় 'যাইয়ুম গই'; আবার এটি বরিশাল অঞ্চলের সাধারণের মুখে উচ্চারিত হয়। 'চইল্যা যামু' অথবা 'যামু গিয়া'। আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য একটি থেকে আরেকটিকে আপন স্বাতন্ত্র্যে উদ্‌ভাসিত করেছে। যদিও এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের এই অপ্রমিত ভাষা স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না, তথাপি এই আঞ্চলিক ভাষা ও তার ব্যবহার, উচ্চারণরীতি বাংলা ভাষার সম্পদরূপে বিবেচিত হবে। নাটকে, উপন্যাসে, কবিতায়, গানে প্রত্যেকটি অঞ্চলের স্থানীয় ভাষার প্রাসঙ্গিক উপস্থিতি একটি রচনায় গুণগত মাত্রা সংযুক্ত করে। এটিও আয়ত্তে আনতে হলে সে-সব অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ফিরে আসি প্রমিত উচ্চারণের প্রাসঙ্গিকতায়। আগেই বলা হয়েছে, এটি আঞ্চলিকতামুক্ত উচ্চারণ, যা সাধারণত আমাদের দেশের শিক্ষিত, মার্জিত, পরিশীলিত বাঙালি আলোচনায়, বক্তৃতায়, অনুষ্ঠানে, গণমাধ্যমে, কখনও বা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে ব্যবহার করে থাকেন। প্রত্যেকটি মানুষই কোনো না কোনো অঞ্চলের বাসিন্দা। বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত মার্জিত মানুষগুলো যখন একত্রিত হন কোনো বিশেষ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বৈঠকে, তখনই সেখানে সকলের সমান বোধগম্যতা ও সৌন্দর্যগত কারণেও সর্বজনস্বীকৃত প্রমিত উচ্চারণে বাংলা ভাষা ব্যবহারের রীতি প্রচলিত একজন তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন চটপটে মানুষের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায় তৎকর্তৃক পরিহিত পরিধানে নয়, তার কথায়, ভাষায় এবং সে ভাষা অবশ্যই হতে হবে প্রমিত।

কিছু কিছু শব্দের বেলায় উচ্চারিত রূপের মধ্যেও এই পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন: প্রশ্ন, অশ্লীল, উচ্ছৃঙ্খল, অক্ষর, মসৃণ ইত্যাদি। এসব শব্দের উচ্চারণে বাক্‌শিল্পীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্রশ্ন ও অশ্লীল শব্দ দু'টির উচ্চারণ শিল্পীরা দু'ভাবেই করেন, প্রস্‌নো/ প্রশ্‌নো, অস্‌স্লিল/ অশ্‌শ্লিল। নিয়মের কথা যদি বলি, তবে প্রথমটাই ব্যাকরণসম্মত ও গ্রহণযোগ্য, কিন্তু ব্যাপক প্রচলিত অর্থে দ্বিতীয়টিকেও একেবারে অশুদ্ধ বলা যাবে না। তেমনি 'উচ্ছৃঙ্খল' শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ যাই হোক, এর ব্যাপক উচ্চারিত রূপ হল 'উস্‌স্রিংখল'। 'অক্ষর' শব্দটির উচ্চারণ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। যেমন, বাংলা একাডেমি (সম্পা: জামিল চৌধুরী) ও সাহিত্য সংসদ (সম্পা: সুভাষ ভট্টাচার্য) প্রকাশিত অভিধানে এর উচ্চারিত রূপ বলা হয়েছে 'ওক্‌খোর'। কিন্তু বাংলা একাডেমির উচ্চারণ অভিধানে (সম্পা: নরেন বিশ্বাস) এর দু'রকম অন্তর্ভুক্তিকেই (অক্‌খর/ওক্‌খোর) স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অক্ষর শব্দে 'অ' যখন না-বোধক অর্থে ব্যবহৃত হবে, তখন তা অক্‌খর্ (খরহীন, নয় খর) উচ্চারণ করাই যৌক্তিক, অন্যথায় উচ্চারণের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী [ শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপরে 'ক্ষ' থাকলে অ কিংবা অ-কার সাধারণত ও/ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়।] এর উচ্চারণ 'ওক্‌খোর্' হওয়াই সংগত। নিয়ম হচ্ছে কোনো বর্ণের সঙ্গে ঋ-কার( ৃ) যুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হবে না। যেমন: আবৃত্তি, অমৃত শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে 'আবৃত্‌তি' ও 'অমৃত' (আব্‌বৃত্‌তি কিংবা অম্‌মৃত নয়)। এই নিয়মানুযায়ী 'মসৃণ' শব্দটির উচ্চারণ 'মোস্রিন' হওয়াই সংগত, কিন্তু এটিকে ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত করে কেউ কেউ এর উচ্চারণে দ্বিত্ব এনে 'মোস্‌সৃণ' বলতেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বাংলা একাডেমির অভিধানে দু'ধরনের উচ্চারণকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- 'মোসৃন্' ও 'মোস্‌সৃন'।

কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণ আমরা ভুল করি শব্দটির সঠিক বানান জানি না বলে। ভুল বানানগুলো ছোটবেলা থেকেই লিখতে লিখতে এবং উচ্চারণ করতে করতে আমাদের মাথায় স্থায়ীভাবে বসে গেছে। কখনও কখনও শব্দগুলো যেমন ভুল লিখি বলে ভুল উচ্চারণ করি, তেমনি ভুল উচ্চারণ করি বলেও ভুল লিখি। যেমন: যুগ্ম (যুগ্‌মো) শব্দটি কেউ কেউ লেখেন এবং উচ্চারণ করেন যুগ্ন (যুগ্‌নো)। এরূপ ঐকমত্য, দুরবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন, গলাধঃকরণ, হীনমন্যতা। এমন আরও অনেক শব্দ আছে, যার অশুদ্ধ বানানের রূপটি যথাযথ উচ্চারণের স্বার্থেই আমাদের সংশোধন করে নেওয়া আবশ্যক। যে-কোনো বর্ণের উচ্চারিত রূপই হল ধ্বনি। ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির সংযোগে শব্দ, শব্দ দিয়ে বাক্য এবং বাক্যের সঙ্গে বাক্য সাজিয়ে আমরা ভাষা সৃষ্টি করি। অর্থাৎ ভাষার ন্যূনতম একক হল ধ্বনি। বাংলা ভাষায় দুই ধরনের ধ্বনি আছে- স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

একটি মোটর গাড়ি চালাতে যেমন জ্বালানির প্রয়োজন হয় মানুষকেও কথা বলার জন্য কিংবা ধ্বনি সৃষ্টির জন্য জ্বালানি গ্রহণ করতে হয়। তার এই জ্বালানি হল বাতাস। মোটর গাড়িটি যেমন তেল কিংবা গ্যাস পুড়তে পুড়তে এগিয়ে চলে, আমরাও বাতাস ছাড়তে ছাড়তে কথা বলি, ধ্বনি উচ্চারণ করি। জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে যেমন গাড়ি থেমে যায়, বাতাস ফুরিয়ে গেলেও ধ্বনি উচ্চারণ অর্থাৎ কথা বলা স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই বাতাস গ্রহণ করতে করতে এবং অনবরত ছাড়তে ছাড়তে আমরা কথা বলা অব্যাহত রাখি। তাই কথা বলার জন্য 'বাতাস' একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে। এই বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে আমরা আমাদের ফুসফুসে সংরক্ষণ করি। ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসে সংরক্ষিত বাতাস মুখ ও নাক দিয়ে বের হতে থাকে। ফুসফুস-তাড়িত এই বাতাস বায়ু-নালী দিয়ে

বেরিয়ে গলনালী হয়ে ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে যদি কোনো জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তবে তা থেকে কোনো ধ্বনি সৃষ্টি হয় না। কোনো না কোনো স্থানে তাকে বাধা পেতেই হবে। কোথায় কোথায় বাধা প্রাপ্ত হতে পারে? তা জানতে হলে মুখাভ্যন্তরে যে বাক্‌যন্ত্রগুলো আছে তা সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়া যাক।

ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে প্রথমেই স্বরযন্ত্র (Larynx) অতিক্রম করে। এই স্বরযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে দু'টো সূক্ষ্ম স্বরতন্ত্রী (vocal cords)। কথা বলার সময় এরাও ঠোঁটের মতো কাজ করে বলে এদের আরেক নাম ভোকাল লিপ্‌স্ (vocal lips)। যাই হোক, শব্দ স্বরতন্ত্রী দুটোকে কাঁপিয়ে দেয় অথবা তাদের দু'পাশ ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। এ ছাড়াও বাক্‌যন্ত্র হিসেবে মুখবিবরে অবস্থিত যেসব প্রত্যঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য, সেগুলো হল: অধিজিহ্বা, জিহ্বা, কোমল তালু, আল্‌জিহ্বা, পশ্চাৎ তালু, শক্ত তালু, দন্ত, দন্তমূল, ও ঠোঁট। এরা প্রত্যেকে ধ্বনি উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালনসহ নানাভাবে সহায়তা করে। তাই এদের নাম বাক্-প্রত্যঙ্গ। প্রতিটি ধ্বনি উচ্চারণের সময় সবকটি বাক্‌প্রত্যঙ্গ যে একই সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে তা কিন্তু নয়। যেমন, ক-বর্গীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় জিভের গোড়ার দিকটি কিছুটা সক্রিয় থাকলেও সামনের দিকটি প্রায় নিষ্ক্রিয়ই থাকে। একইভাবে প-বর্গীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় জিভের তুলনায় ঠোঁটের সক্রিয়তা দৃশ্যমান হয়, জিভ সটান হয়ে পড়ে থাকে নিচে। আবার চ-বর্গীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় দেখা যায় জিভ সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন ঠোঁট খুব বেশি সক্রিয় না হলেও তার আকারে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।

ধ্বনি উচ্চারণে বাক্-প্রত্যঙ্গের মধ্যে জিভের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। জিভের ৩টি ভাগ রয়েছে- অগ্রভাগ (ডগা), মধ্যভাগ ও পশ্চাৎভাগ বা জিভের গোড়া।

এ ছাড়াও রয়েছে আলজিহ্বা ও অধিজিহ্বা। জিভের বিভিন্ন ভাগের স্পর্শের ওপর ভিত্তি করে তালুকেও ভাগ করা হয়েছে, যেমন: অগ্রতালু (দন্তমূলের ঈষৎ পেছনে), মধ্যতালু (শক্ততালু) ও পশ্চাৎ তালু (কোমল তালু) ইত্যাদি। ত-বর্গীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় দাঁতের অংশগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। দাঁতের পেছনে জিভের ডগা আঘাত করে এই ধ্বনিগুলো সৃষ্টি করে। স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় বাক্-প্রত্যঙ্গগুলোকে আপাতনিষ্ক্রিয় মনে হলেও ঠোঁট ও জিভের অবস্থানগত কিছুটা সক্রিয় পরিবর্তন এখানে লক্ষ করা যায়। এভাবেই ধ্বনি উচ্চারণ-কালে বাক্‌যন্ত্রের কোনোটি সক্রিয়, কোনোটি অর্ধসক্রিয় আবার কোনোটি নিষ্ক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করে।

সুতরাং ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরে অবস্থিত বাক্-প্রত্যঙ্গের কোনটির ভূমিকা কী, কোনটি কোথায় কতটুকু স্পর্শ করবে, তখন ফুসফুস-তাড়িত বাতাসের পরিমাণ কী হবে ইত্যাদি জেনে নিয়মিত চর্চা করতে পারলে প্রমিত উচ্চারণে কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। আমরা নিজেরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলি তখন যদি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা কমিয়ে আনতে চেষ্টা করি এবং শুদ্ধ উচ্চারণের বিষয়টিকে মাথায় রেখে তা প্রয়োগ করতে সচেতন হই, তবে নিশ্চয়ই আমরা ক্রমশ আশেপাশের মানুষগুলোর কাছে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য, সমাদৃত, উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠতে পারবো। এ বিষয়ে বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

**প্রফেসর জিয়াউল হাসান**
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ

## বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাসিক প্রকাশনা *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অনেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমাদেরকে চিঠি দিচ্ছেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন* পেতে হলে পাঠকদের কী করণীয় তা আমরা আগেও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছি। তাদের সুবিধার্থে আবারও জানাচ্ছি, এতদিন *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চ ডাক মাশুলের কারণে আমাদের পক্ষে আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বুলেটিন পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠকদের বুলেটিনের গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতেও *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। তবে গ্রাহকদেরকে ডাক মাশুল বাবদ বছরে ১০০ টাকা এবং ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। এই টাকা সরাসরি অথবা মানি অর্ডারযোগে সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

তপন কুমার দাশ

# মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা: চ্যালেঞ্জ ও অগ্রগতি

বিগত দুই শ' বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পেল সমাজের সম্মুখভাগে অবস্থানরত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী, তারা এগিয়ে গেল আরো সামনের দিকে। এর ফলে যে বিশেষ কিছু সম্প্রদায় বা শ্রেণিভুক্ত জনগোষ্ঠী নিজ অবস্থানে থেকেও আরো পিছিয়ে গেল তা বুঝতেই লেগে গেল প্রায় দেড় শ' বছর।

অন্যান্য অনেক অধিকারের মতো শিক্ষার দিক থেকেও মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়ল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠী। সারা পৃথিবীর সকল পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সংগঠিত গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, 'উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বর্তমানে প্রায় ১২১ মিলিয়ন শিশু শিক্ষকের বা ক্লাসরুম ইনস্ট্রাকশন বুঝতে পারে না। গবেষকদের মতে, পৃথিবীর অনেক দেশেই জাতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক কোনো ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হয়, যা অনেক আদিবাসী শিশুরা তাদের মা-বাবার কাছ থেকে শোনে না বা তারা পরিবারে সে ভাষা ব্যবহার করে না। ফলে, শ্রেণিকক্ষে যা বলা হচ্ছে বা পড়ানো হচ্ছে তা আদিবাসী শিশুদের কাছে একেবারেই অপরিচিত বলে মনে হয়। বই-পত্র, নির্দেশনা বা এ সংক্রান্ত কোনো কিছুর নির্দেশনা বা সংকেত তারা বুঝতে পারে না। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বেশির ভাগ শিশুই বাড়িতে বা পরিবারে যে ভাষায় কথা বলে, বিদ্যালয়ে সে ভাষায় কথা বলার সুযোগ পায় না। এতে করে তারা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়। সংকল্প অটুট থাকার পরও শুধুমাত্র নিজ ভাষায় লেখাপড়া করতে না পারার কারণে এসব শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে।

ইউনেস্কোর এক গবেষণায় বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একটি সুসঙ্গত ভাষানীতি তৈরি করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রাথমিকভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে বিশেষ করে শিখন নির্দেশনা প্রদান করতে অবশ্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, ভাষাকে খুব যত্ন সহকারে পরিচিত করার কাজটিও করতে হবে। গবেষণায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, যদি প্রথম ভাষা কেউ ভালোভাবে রপ্ত করতে পারে তাহলে দ্বিতীয় ভাষায়ও সে ভালো করতে পারে। শিশুদের উপযোগী করে নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম এবং পর্যাপ্ত পাঠ ও নির্দেশনামূলক উপকরণ তৈরি করতে হবে। পর্যাপ্ত উপকরণের অভাবে শিশুদের শিখন প্রক্রিয়ায় অতিশয় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। একই সঙ্গে শিক্ষকদেরও মাতৃভাষায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কেন্দ্রীভূত নিয়োগ পদ্ধতির সংস্কার করে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারে পারদর্শী শিক্ষক স্থানীয়ভাবে নিয়োগের বিধান চালু করতে হবে। এজন্য শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের বিকেন্দ্রীকরণ খুবই জরুরি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে অনেক বিনিয়োগ করার প্রয়োজন আছে কী? কিন্তু মনে রাখতে হবে, শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া এবং তাদের পুনরায় শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে আসতে হলে অনেক অপচয় হয় এবং পুনঃবিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ প্রয়োজন, তা পূর্বোক্ত বিনিয়োগের চেয়ে অনেক কম।

গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করলে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করে ও লেখাপড়ার মানও থাকে

সন্তোষজনক। খুব অল্পসংখ্যক দেশ এরই মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহার করে অনেক ভালো ফলাফল অর্জন করেছে। এসব গবেষণার বিষয়বস্তু জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উত্থাপন করা দরকার, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিদ্যমান অবস্থা বিশেষ করে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করতে পারে।

**বাংলাদেশ প্রসঙ্গ**

বাংলাদেশেও অনেক জাতিগোষ্ঠীর আদিবাসী মানুষ রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, বর্ণমালা কিংবা ভাষার লিখিত রূপ। এসব ভাষায় আদিবাসী শিশুদের লেখাপড়া করানোর প্রচেষ্টাও গৃহীত হয়েছে অনেক আগে থেকেই।

ইউনেস্কোর সহায়তায় আরডিসি (Research and Development Collective ) ও গণসাক্ষরতা অভিযান সম্পাদিত এক জরিপে দেখা যায়- বাংলাদেশে ৭৮টি আদিবাসী ও অ-আদিবাসী জাতিসত্তার জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১০২টি সংস্থা ২৯টি জেলার ১১২টি উপজেলায় আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই সকল কার্যক্রমের আওতায় ১০ ভাগ শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও ৯০ ভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে।

এমএলই কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের শিক্ষা কর্মসূচির ধরনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। মাত্র ২৯ ভাগ সংস্থা সংশ্লিষ্ট মাতৃভাষায় উন্নীত শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই ও উপকরণ ব্যবহারসহ শিখন-শেখানোর মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহার করছে। বাকি ৭১ ভাগ সংস্থা শুধু শিখন-শেখানোর মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহার করছে।

**বাংলাদেশে এমএলই উপকরণ**

আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় উন্নীত মোট ১৮৫ ধরনের উপকরণ ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য উপকরণসমূহ হচ্ছে বর্ণমালার চার্ট, গণনা চার্ট, প্রাইমার/বই, পোস্টার, ছবি, ফ্লিপ চার্ট, কর্নার সাজানোর উপকরণ, বিভিন্ন মডেল, ব্লক, পাজেল ইত্যাদি। সমতলের আদিবাসীদের চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের ভাষায় উন্নীত বই ও উপকরণের সংখ্যা বেশি। শুধু চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় ৬১ ধরনের বই আছে। ৮টি আদিবাসী ভাষায় বর্ণমালা হিসেবে রোমান এবং ৫৮টি আদিবাসী ভাষায় বর্ণমালা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করে উপকরণ উন্নয়ন করা হয়েছে।

**এমএলই সম্প্রসারণে গৃহীত জাতীয় উদ্যোগ**

আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ২০০৭ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযানও সুনির্দিষ্ট কর্ম-উদ্যোগ গ্রহণ করে। জাতীয় পর্যায়ে সভা-সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বিস্তারধর্মী এসব কর্ম-উদ্যোগ বাস্তবায়নে গণসাক্ষরতা অভিযান ও পার্টনার এনজিওদের সঙ্গে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে। নেটওয়ার্কের প্রচেষ্টায় এবং সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীকার সন্নিবেশিত হয়।

**জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
- জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
- সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারায় শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।
- শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

**প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য -**

- মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক ও শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। একাজ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব।
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

**প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যায়ে আদিবাসী শিশু অংশে বলা হয়েছে:**

- আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে।

- আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।
- আদিবাসী অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, সেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যেহেতুে কোনো কোনো এলাকায় আদিবাসীদের ঘনবসতি নেই, তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে সেদিকেও নজর দেওয়া হবে।

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার উদ্যোগকে তরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় এডভোকেসি করার উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উদ্যোগে সংশিষ্ট পার্টনার এনজিও এবং আদিবাসী গ্রুপ ও ফোরামের অংশগ্রহণে ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০-এ একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে সকলকে নিয়ে একটি বহুভাষিক শিক্ষা ফোরাম (এমএলই ফোরাম) গঠনের প্রস্তাবনা গৃহীত হয়।

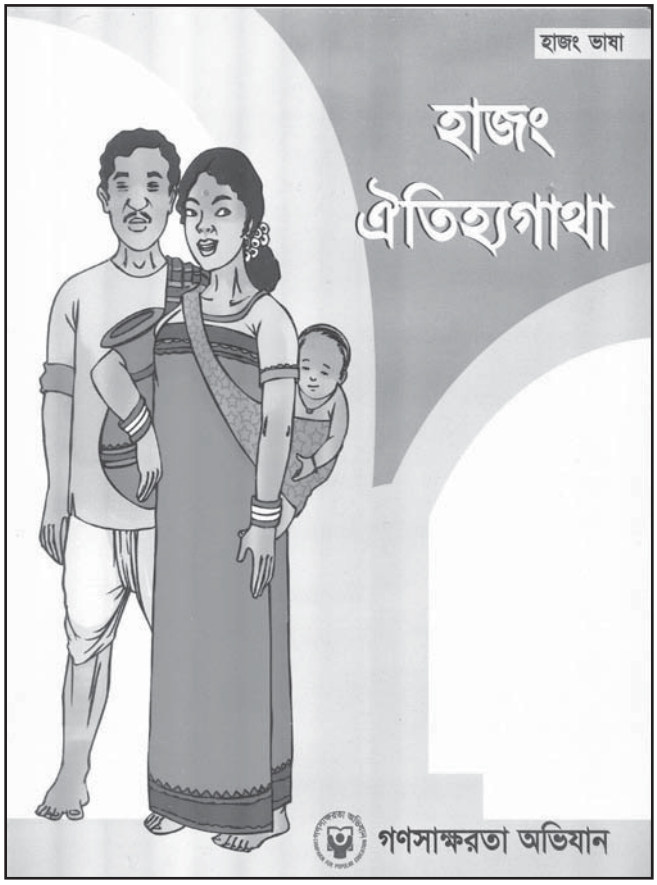


এ প্রস্তাবনা অনুসারে গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও মানবাধিকার কমিশনের সদস্য সেলিনা হোসেনকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় এমএলই ফোরাম। গণসাক্ষরতা অভিযান এ ফোরামের সদস্য সচিব হিসেবেও মনোনীত হয়। অক্টোবর ২০১০-এ এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এমএলই ফোরাম থেকে একটি ব্রিজিং প্ল্যান উত্থাপিত হয়।

একই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক সভায়ও মহাপরিচালক মহোদয় এমএলই ফোরামের প্রস্তাবনা গ্রহণ করেন। এরই আলোকে আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এমএলই উপকরণ প্রণয়নের কাজ শুরু করতে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবিকে অনুরোধ জানান। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমএলই ফোরাম কর্তৃক ৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা নিয়ে কর্মরত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধি ও ভাষা কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি আকারে প্রেরণের জন্য এমএলই বাস্তবায়ন বিষয়ক সুপারিশমালা তৈরি করা হয়।

উপর্যুক্ত সুপারিশমালা নিয়ে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে এমএলই ফোরামের অংশগ্রহণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব আবদুল আউয়াল মজুমদার মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনতিবিলম্বে সংশিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক এমএলই উপকরণ প্রণয়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক ৫/৬টি আদিবাসী ভাষা নির্বাচন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য এমএলই ফোরামকে অনুরোধ জানানো হয়। সে অনুসারে ৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে বিভিন্ন আদিবাসী ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা বিবেচনা করে সর্বসম্মতভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদরি, গারো ও সাঁওতাল ভাষায় শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের কাজ শুরু করে। ৩টি পর্যায়ে সকল জাতিসত্তার জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অতিরিক্ত এস. এম. আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি মনোনীত করে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে অন্যান্য সকলের মধ্যে এমএলই ফোরামের প্রতিনিধিরাও অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে অতিরিক্ত সচিব এস. এম. আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ ও এমএলই ফোরাম-এর অংশগ্রহণে আয়োজিত এক সভায় ৬টি ভাষায় মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই মর্মে ৬ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে বিভিন্ন মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশিত হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে এমএলই ফোরাম-গণসাক্ষরতা অভিযান, এনসিআইপি ও সেভ দ্য চিলড্রেন-এর উদ্যোগে

সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত হয় জাতীয় সেমিনার। সেমিনারে উপস্থিত হয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেনসহ অন্যান্য নীতি নির্ধারকরা পর্যায়ক্রমে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা উপকরণ আদিবাসী শিশুদের হাতে তুলে দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এসব প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিবার্য কারণবশত ৬টি ভাষার পরিবর্তে আপাতত ৫টি ভাষায় এমএলই উপকরণ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, সাঁওতাল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী কোন বর্ণমালায় স্ক্রিপ্ট তৈরি হবে (রোমান নাকি বাংলা) সে সিদ্ধান্ত নিতে একমত না হতে পারায় শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল ভাষায় উপকরণ উন্নয়নের কাজ স্থগিত করা হয়। এই মর্মে ১৪ নভেম্বর মন্ত্রণালয়ের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এমএলই ফোরাম কর্তৃক ১৮ নভেম্বর তারিখে ৫টি ভাষা কমিটি গঠন করতে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় হিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন। এ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯ নভেম্বর অতিরিক্ত সচিব এস. এম. আশরাফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এমএলই ফোরাম কর্তৃক ৫টি ভাষায় এমএলই উপকরণ প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ৫টি কমিটির নাম পেশ করা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সংশ্লিষ্ট হিল ডিস্ট্রিক্ট-এর মতামতের সঙ্গে সমন্বয় করে লেখক তালিকা চূড়ান্ত করা হয়।

দীর্ঘদিনের দাবি-দাওয়া, পরামর্শ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে দেরিতে হলেও এনসিটিবি কর্তৃক গত ২২ মার্চ ২০১৫ থেকে শুরু হবে মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা। ৩টি পর্যায়ে এ ধরনের কর্মশালায় মিলিত হয়ে প্রায় ২৫ জন লেখক ৫টি ভাষায় আগামী এপ্রিলের মধ্যেই প্রাক-প্রাথমিকের জন্য এমএলই উপকরণ উন্নয়নের কাজ শেষ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। সব কিছু ঠিক থাকলে পিইডিপি ৩-এর আওতায় ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ৫টি ভাষাভাষী আদিবাসী শিশুদের হাতে মাতৃভাষাভিত্তিক উপকরণ পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

তবে, এখনই প্রশ্ন উঠেছে এসব উপকরণ ব্যবহারের জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুতি বা প্রশিক্ষণ কীভাবে হবে। বাঙালি শিক্ষকদের পক্ষে এসব উপকরণ ব্যবহার সম্ভব হবে কিনা, অন্যান্য ভাষাভাষী শিশুরা কীভাবে এসব ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হবে ইত্যাদি। এরই মধ্যে এমএলই ফোরাম থেকে এমএলই উপকরণভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য আশু করণীয় চিহ্নিত করে কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। আশা করি, এসব বিষয়ে অনতিবিলম্বে উদ্যোগ গৃহীত হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মানদণ্ড নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ সমন্বিতভাবেই সম্পাদন করতে হবে।

এক্ষেত্রে প্রতিবেশী ভারতসহ বিভিন্ন দেশে আদিবাসীদের শিক্ষা উন্নয়নে গৃহীত সরকারি উদ্যোগ ও ভূমিকা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ভারতের ত্রিপুরা এবং মিজোরামে মিজো এবং ত্রিপুরা (ককবরক) ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনাসহ শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে অনেক আগেই। থাইল্যান্ডে আদিবাসী শিশুর জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক তৈরি ও মৌলিক শিক্ষাদানে সাফল্য এসেছে। এমনকি নাইজেরিয়া এবং ফিলিপাইনের শত শত আদিবাসী গোষ্ঠীর শিক্ষা উন্নয়ন ঘটিয়েছে সরকার।

প্রাক-প্রাথমিকের জন্য এমএলই উপকরণ উন্নয়নের কাজ শেষ করেই অনতিবিলম্বে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এমএলই উপকরণ প্রণয়নের কাজ শুরু করতে হবে। বুঝতে হবে যে, প্রাক-প্রাথমিকে এক বছর এমএলই উপকরণ ব্যবহারের পর শিক্ষার্থীদের হাতে প্রথম শ্রেণিতেই যদি মাতৃভাষার উপকরণ তুলে দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তারা আবার হোঁচট খাবে এবং সেটাই হতে পারে প্রকৃত ট্র্যাজেডি। সঙ্গে সঙ্গে বৃথা যাবে এ পর্যন্ত সংগঠিত সকল প্রয়াস।

তাই এনসিটিবিকে আগামী দুই বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির এমএলই উপকরণ উন্নয়নের কাজ শেষ করতে হবে। একই সঙ্গে নীতিনির্ধারকদের অঙ্গীকারসহ সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার বিবেচনায় সাঁওতাল ভাষাসহ অন্যান্য আদিবাসী ভাষায়ও শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের কাজ শুরু করতে হবে। এ এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। এ কর্মযজ্ঞ সম্পাদনে অনেক বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রশিক্ষিত জনবলের। এনসিটিবি-তে উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে একটি বিশেষ ইউনিট বা শাখা খোলা যেতে পারে।

সরকার, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং আদিবাসী জনগণকে একসঙ্গে, একযোগে কাজ করতে হবে। সমন্বিত প্রয়াস গ্রহণের মাধ্যমেই সুফল অর্জন ত্বরান্বিত হতে পারে।

আশা করি, সে লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে যাব।

**তপন কুমার দাশ**
উপ-পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

শ হী দু ল্লা হ  শ রী ফ

# শিশুর মাতৃভাষা-শিখনের প্রয়োজনীয়তা

শিশুর মাতৃভাষা-প্রেম শুধু দেশপ্রেমের অংশ বা মাতৃভূমির প্রতি প্রেমজাতই নয়; তার চেয়েও বেশি কিছু। মাতৃভূমি আমাদের কাছে মায়ের সমান শ্রদ্ধেয়। তাই তাকে ভালোবাসতে হয় মায়ের মতো। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসার জন্যই নয়, শিশুর বিকাশ ও জাতীয় সমৃদ্ধির জন্যও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ প্রয়োজন। মাতৃভূমির স্বাধীনতা হারালে দাসত্ব-শৃঙ্খল এসে পড়ে পায়ে। কিন্তু মায়ের ভাষা হারালে শুধু স্বাধীনতাই হারিয়ে যায় না, ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ ও সমাজ তথা  জাতির বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। তার মানে মায়ের ভাষার সহজাত পথ ধরে বেড়ে ওঠার সুযোগ-হারা হওয়ার পরিণাম পরাধীনতার শৃঙ্খলের চেয়েও ভয়াবহ; কিন্তু বুঝে শুনে সেই ভয়াবহ পরিণাম-শৃঙ্খল "কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়"।

মানুষের জন্ম-পরিচয়, কিংবা জাতিপরিচয় একটি চিরস্থায়ী বন্ধন। মানুষের ভাষা-পরিচয় তথা মাতৃভাষার বন্ধনও জাতিপরিচয়ের মতোই একটি চিরস্থায়ী বন্ধন। মানুষ মাতৃভাষার বন্ধন কখনোই মুছে ফেলতে পারে না, চাইলেও ছিন্ন করতে পারে না তা সে জন্মযোগ থেকে যত দূরেই থাকুক। কেননা, মানুষ মাতৃভাষার সূত্রে একতাবদ্ধ হয় এবং সেই বন্ধন প্রবাহিত হয় কাল থেকে কালান্তরে। এজন্য মাতৃভাষা অবলম্বন করে মানুষের যে ব্যক্তিত্ব ও গোষ্ঠীগত সত্তা গড়ে ওঠে সেটাও তাই কখনো মুছে যাওয়ার নয়।

অন্য ভাষা অবলম্বন করে নতুন একটি গোষ্ঠীগত সত্তা আয়ত্ত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই  আমাদের  মনের সহবর্তিনী  হয়ে চলতে পারে না। সেই জন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে। চারদিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ; সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোট বইয়ের শাসন, আমাদের বিচারবুদ্ধিতে নেই সাহস; আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে; শ্বশুরবাড়ি নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া-নৌকাটা গেল কোথায়?" (শিক্ষার বিকিরণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

মাতৃভাষা হচ্ছে অন্য ভাষায় (দ্বিতীয়তৃতীয় বা আরও ভাষা) প্রবেশের সিংহদ্বার। সাধারণত কোন ব্যক্তিকে মাতৃভাষার সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকেই অন্যভাষা শিখতে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ  বলেছেন, 'আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন'।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সাথে তুলনা করেছেন, "শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার মন্ত্র-মুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।" (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

মাতৃভাষার সাথে অন্যভাষা শেখার কোনো বিরোধ নেই। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা অবশ্যই শেখা দরকার। ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা যার মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। বাংলাদেশে ইংরেজি একটি বহুল ব্যবহৃত ভাষা। বাংলার পরেই ইংরেজির স্থান। বাংলাদেশে ইংরেজি মাধ্যমে বা ইংরেজি ভার্সনে পড়ানোর প্রতি মা-বাবা তথা অভিভাবকদের আগ্রহ প্রবল। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা সমাজ ও পেশাগত জীবনে সাফল্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণের ধারণা যেসব ছাত্ররা ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াশুনা করে বা যারা পাবলিক স্কুলে পড়ে কিন্তু ইংরেজিতে খুব ভাল তারা পরবর্তী কালে ভালো চাকরি পাবে। যেসব ছাত্র বা আবেদনকারী ইংরেজিতে ভাল, তাদেরকে দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই ইংরেজি ভাষার অর্থনৈতিক মূল্য আছে। এই বাস্তবতার কারণে অনেকে ইংরেজি মাধ্যমে বা ইংরেজি ভার্সনে পড়ছে। কিন্তু ইংরেজি মাধ্যমে পড়লেও মাতৃভাষার সঙ্গে তাদের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা উচিত। এটা নিয়ে বিতর্ক থাকার কোনো অবকাশ নেই।

বিশিষ্ট শিক্ষাবদি সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সম্প্রতি তাঁর একটি লেখায় তুলে ধরেছেন যে, আমাদের দেশের অনেক পরিবার এ রকম একটি ধারণা পোষণ করে যে ইংরেজি মাধ্যমে যারা পড়ছে, তাদের বাংলায় কিছু পড়ার বদলে পাঠ্যবইয়ের পেছনে সময়টা দিলে 'ও' বা 'এ' লেভেলে ভালো ফল করা যাবে। অর্থাৎ বাংলা গল্প, উপন্যাস বা ভ্রমণকাহিনি পড়া সময়ের অপচয়। আমাদের দেশের অনেক পরিবার এ রকম একটি ধারণা পোষণ করে যে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করলে বাংলাটা ভালো রপ্ত করা যায় না। বলা বাহুল্য, ধারণাটা ভুল। এধরনের ভুল বিশ্বাস ও ধারণার কারণে মাতৃভাষার সঙ্গে তাদের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে না বা যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে না।

বিশ্বায়নের যুগে শিশুরা বহুভাষায় দক্ষ হবে এটাই প্রত্যাশিত। তাই ইংরেজি মাধ্যমে যারা পড়াশোনা করছে, তারা ইংরেজিতে লেখা নানা বই পড়বে, সেটিই স্বাভাবিক। ইংরেজি ভার্সনের শিক্ষার্থীদের অনেকের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। কিন্তু পাশাপাশি তারা যদি মাতৃভাষায় লেখা বই পড়ে তাহলে তাদের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে একটা ভারসাম্য আসবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে যা পর্যবেক্ষণ করেছেন তা হল: 'ইংরেজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল। .... চিন্তাশক্তি এবং কল্পানাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটো পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না এ কথা অতি পুরাতন। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ এক প্রকার রুদ্ধ। ...এইজন্য ইংরেজি ভাবের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। ...

আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলো কথার বোঝা টানিয়া। ... যখন ইংরেজী ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না।' ... বিষয়টিকে তিনি যেভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন তা আজও পরিবর্তন হয় নি।

সুতরাং যেসব শিক্ষার্থী মাতৃভাষার চর্চা করবে না, একটা শূন্যতা তাদের জীবনে থেকেই যাবে। সে শূন্যতা তাদের মধ্যে সামাজিক দৈন্যও তৈরি করতে পারে। যেমন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আত্মীয়ের মধ্যে প্রতিবেশীর মধ্যে তথা সমাজে ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ও বাংলা মাধ্যমে জানা ও ব্যবধান দাঁড়িয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন 'ব্যবধান দাঁড়িয়ে গেলে পরম দুঃখের কারণ হবে।' সেই ব্যবধান কি আমাদের বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে যায়নি?

পরিবারগুলোর উচিত এই শূন্যতা যাতে না থাকে, এবং সমাজে যাতে ব্যবধান দাঁড়িয়ে যায় সেদিকে লক্ষ রাখা। পরিবার যদি তাদের বই কিনে দেয় এবং এসব বই পড়তে অনুপ্রেরণা দেয়, তাহলে কাজটি সহজ হয়। মনে রাখতে হবে, সন্তানদের জন্য এটি একটি বড় বিনিয়োগ। শিশু-সন্তানেরা দেখে শেখে। উদাহরণ থেকে অনুপ্রেরণা পায়। সুতরাং সন্তানদের মাতৃভাষামুখী করার জন্য তাই পরিবারগুলোকে প্রথমে মাতৃভাষামুখী হতে হবে। শিশুর মধ্যে প্রারম্ভিক শৈশবেই মাতৃভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের বীজ বপন করতে হবে। মাতৃভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের এই ভিত্তি যদি শৈশবেই স্থাপিত হয়, তাহলে দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হবে ও বৃদ্ধি পাবে। এভাবেই শিশুর দেশপ্রেশ সৃষ্টি হবে। সে সমাজের প্রতি তার দায় সম্পর্কেও শৈশব থেকে সচেতন হয়ে উঠবে।

**শহীদুল্লাহ শরীফ**
শিক্ষা-গবেষক ও লেখক
আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

# কমিউনিটি রেডিওতে "সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস্" (এসআরএইচআর) এডুকেশন বিষয়ক নাটিকা

রসুলপুর স্কুলের শিক্ষক বকুল এবং গোলাম রসুল। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয়। বকুল আপা এবং গোলাম রসুল স্যারের কাছে ছাত্র-ছাত্রীরা খুব সহজেই তাদের মনের কথা বলতে পারে। যে কোন বিপদে বন্ধুর মতো তাদের পাশে থেকে সমস্যার সমাধানে আপ্রাণ চেষ্টা করেন বকুল আপা এবং গোলাম রসুল স্যার। প্রয়োজনে কথা বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মায়ের সাথেও। কঠিন সমস্যার সহজ সমাধানের পথ দেখাতে পারেন তারা। আর তাই মর্জিনাকে নিয়ে তার চিন্তিত মা সমাধানের আশায় ছুটে যান বকুল আপার কাছে- "বকুল আপা, মর্জিনার ব্যাপারে কিছু বলার ছিল...আজকাল মর্জিনার মধ্যে বেশ কিছু পরির্তন দেখছি। সে ইদানীং কথা কম বলে। ঘুরেফিরেই আয়না দেখে। আমার জানি কেমন কেমন লাগে তাকে" বকুল আপা সুন্দর করে মর্জিনার মাকে বুঝিয়ে বলেন, "এই পরিবর্তনগুলো বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তনের জন্যই হচ্ছে। ..... আপনার মেয়েটি এখন কিশোরী। তাই ওর এরকম হচ্ছে।"

বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন শুধুমাত্র মেয়েদের হয়, তা কিন্তু নয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে একইরকম পরিবর্তন হয় এবং একইভাবে তাদেরও সঠিক বয়সে সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন। বকুল আপার সাথে কথা বলে সচেতন হয় মর্জিনার মা। আর তাই তরকারি কাটতে গিয়ে মর্জিনার মায়ের মনে হয় মর্জিনার কাছাকাছি বয়সের ছেলে মজিদের কথা। আপন মনে সে ভাবে, মেয়ের মতো তার ছেলেরও কী কোন পরিবর্তন হচ্ছে? তার বয়সও তো ওই ১৪/১৫ বছর হলো। এ বিষয়ে বকুল আপাকে একটু জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়!

যেই ভাবা সেই কাজ! মর্জিনার মা আবারও স্কুলে যায় বকুল আপার সঙ্গে দেখা করতে। বকুল আপা তাকে বুঝিয়ে বলে, "এই সময়ে কমবেশি সব কিশোরের শারীরিক পরিবর্তন আসে। কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগ বাবা-মা শারীরিক এই পরিবর্তনটি নিয়ে তাদের কিশোর বয়সী ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পান। কিন্তু এতে করে আমরা তাদেরকে একরকম বিপদেই ফেলে দিই।" জবাবে মর্জিনা এবং মজিদের মা বলেন, "সত্যি আপা আপনার কাছে এসে অনেক কিছু জানলাম। আসলে লজ্জা-শরমে তো আমরা পোলাপানের সঙ্গে এগুলো নিয়ে কথাই বলতে চাই না। আপনার সঙ্গে কথা বলে এখন বুঝতে পারছি, ওদের সঙ্গে আমাদের কথা বলা উচিত। এমন পরিবর্তন যে স্বাভাবিক, সেকথা বললে ওদেরও অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর জানা হয়ে যাবে।" শুধু মা-বাবা নন, ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাও বন্ধু ভেবে অনেক কিছুই বলে বকুল আপাকে। সহপাঠী জমিলাকে জোর করে ১৮ বছরের আগেই বিয়ে দেয়া হচ্ছিল। নিরূপায় বন্ধুরা তাই বকুল আপাকে বলে, "আপা আমাদের ক্লাশের জমিলার আজকে বিয়ে, কিন্তু ও বিয়ে করতে চায় না, আরও পড়তে চায়। আপনি কী যাবেন আপা ওদের বাড়ী? আপনাকে তো গ্রামের লোকরা মানে, আপনি বললে নিশ্চয়ই শুনবেন বড়রা।" একইভাবে গোলাম রসুল স্যার সিগারেট খাওয়া নিয়ে মনিরের উপর রাগ করায় মনিরের বাবাকে বুঝিয়ে বলেন, "আক্কাস ভাই এই বয়সের ছেলেরা সমবয়সী বন্ধু অথবা বড়দের দেখে কৌতুহলের বশে অনেক সময় এমন কাজ করে ফেলে। কিন্তু তাদের ধমক দিয়ে বা মেরে এর সমাধান করা যাবে না।" এ কথাগুলো এলাকাভিত্তিক আঞ্চলিক ভাষায় ছোট্ট ছোট্ট নাটিকার মধ্য দিয়ে কমিউনিটি রেডিওর শ্রোতাদের সচেতন করা হয় "সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস্ (এসআরএইচআর) এডুকেশন" বিষয়ে।

কেন্দ্রীয় চরিত্রে বকুল আপা এবং গোলাম রসুল স্যার। নাটকের মধ্য দিয়ে জনপ্রিয়তা পাওয়া এই চরিত্রগুলো খুব সহজেই হতে পারে বাস্তব জীবনে অনুসরণীয়।

**প্রেক্ষাপট**

গণসাক্ষরতা অভিযান "সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস্ (এসআরএইচআর) এডুকেশন বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও সংবেদনশীলকরণের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রচারাভিযান অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনা সভা, সাংবাদিক প্রশিক্ষণ, টিভি টক শো প্রচার, রেডিও অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার ইত্যাদি। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কমিউনিটি রেডিওতে "সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস্ (এসআরএইচআর) এডুকেশন" সংক্রান্ত বিষয়ে কমিউনিটি রেডিওতে অনুষ্ঠান

আয়োজনের পরিকল্পনা নেয়া হয়।

**উপকারভোগী (টার্গেট গ্রুপ)**

- কিশোর-কিশোরী
- অভিভাবক
- শিক্ষক
- এসএমসির সদস্য, কমিউনিটির অন্যান্য জনগণ এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ

**কৌশল**

- কমিউনিটি রেডিও সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় নাটিকা প্রচার;
- নাটকের মধ্য দিয়ে আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য এবং করণীয় বার্তা সকলের কাছে পৌছে দেয়া;
- প্রাঞ্জল এবং সহজবোধ্য ভাষার ব্যবহার;
- এসএমএস এবং শ্রোতা ক্লাবের সদস্যদের মতামত গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

**প্রচারিত নাটিকার বিষয়বস্তু**

বেড়ে ওঠার জানা-অজানা কথা নামে প্রচারিত ১০ পর্বের ছোট নাটিকায় যে বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে-

- কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে জানা অজানা কথা
- বাল্যবিবাহ
- পরিকল্পিত পরিবার
- ধূমপানে বিষপান
- মোবাইল ফোনে বয়সন্ধিকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরণের অপরাধ
- বয়ঃসন্ধিকালীন নৈতিক অবক্ষয়
- বয়ঃসন্ধিকালীন ভুল সিদ্ধান্ত

**সম্প্রচারকারী কমিউনিটি রেডিও**

- রংপুর অঞ্চলের রেডিও চিলমারী
- মৌলভীবাজার অঞ্চলের রেডিও পল্লীকণ্ঠ
- ঝিনাইদহ অঞ্চলের রেডিও ঝিনুক
- চট্টগ্রাম অঞ্চলের রেডিও সাগরগিরি

**মতামতের সারসংক্ষেপ**

- সম্প্রচারিত এলাকায় কিশোর কিশোরীসহ এলাকার অন্যান্য জনগোষ্ঠী বয়ঃসন্ধিকালীন বিষয় সম্পর্কে সচেতন হয়েছে যা টেকসই জীবনমান উন্নয়নে বড় ধরনে ভূমিকা রাখবে।
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসহ বয়ঃসন্ধিকালীন বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে।
- অনুষ্ঠানের গুনগত মান শ্রোতাদের গ্রহণযোগ্য ছিল।

**সুপারিশসমূহ**

- কিশোরদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও বাল্যবিবাহ মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই বিষয়টি আরো গুরুত্ব সহকারে সম্প্রচার প্রয়োজন।
- বাল্যবিবাহ সম্পর্কৃত বিষয়সমূহের আরো খুঁটিনাটি তথ্য প্রদান সহ নতুন আঙ্গিকে সম্প্রচার করলে শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেত।
- শ্রোতা ক্লাব হতে সরাসরি ফিডব্যাক গ্রহণ করলে আরও ভাল হতো।
- সম্প্রচার এলাকার বিদ্যালয়সমূহকে সম্পৃক্ত করতে পারলে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেত।

বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হবে এটাই স্বাভাবিক। এই পরিবর্তনে তারা সংকোচ বোধ করতেই পারে! বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ের স্বাভাবিক পরিবর্তন গুলোকে নিয়ে লুকোচুরি কিংবা গোপনীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করা হলে কিশোর-কিশোরীরা তাদের করণীয় জানতে পারে না। বড়দের সাথে তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে তারা দ্বিধায় থাকে, ভয় পায়। আমাদের দেশে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী মোট ২৭ মিলিয়ন যা কিনা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ (সূত্র: ইউনিসেফ)। এদের অনেকেই শিক্ষা জীবন সমাপ্তির আগেই কিংবা শিক্ষা জীবন শুরু না করেই জীবিকার সন্ধানে পেশাগত জীবনে জড়িয়ে যায় এবং বিবাহ করে। সামাজিক সংস্কারজনিত বাধা, পারিবারিক রক্ষণশীলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাবের কারণে বিবাহিত জীবনে তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। গর্ভকালীন স্বাস্থ্য ঝুঁকি, মানসিক চাপ এবং সম্পর্কে অনভিপ্রেত সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। মাতৃ ও শিশুমৃত্যুও বৃদ্ধি পায়।

বয়ঃসন্ধিক্ষণ একজন কিশোর-কিশোরীর জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় মানসিক পরিবর্তনও। এই পরিবর্তন যে মানুষের জীবনচক্রের স্বাভাবিক অংশ, সেই সম্পর্কে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধারণা দেয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে অনেক অভিভাবকের অজ্ঞতা ও অসতর্কতা যেমন কাজ করে, তেমনি জড়তা এবং লজ্জা অনুভব করেন কেউ কেউ। ফলে এই সময়টাতে পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে কিশোর-কিশোরীরা সবাই নিঃসঙ্গ বোধ করে এবং কখনও কখনও নেতিবাচক ঘটনার কারণ হয়। বাবা-মা, অভিভাবকদের এ বিষয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সমাজের সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিশেষ করে নীতি নির্ধারকদের ইতিবাচক মনোভাব। এ পরিস্থিতিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং গণমাধ্যমকর্মীসহ সমাজের অন্যান্য অংশীজনদের মাঝে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে খুব দ্রুত এবং সহজে সংশ্লিষ্ট বার্তা পৌছে দেয়া সম্ভব ।

**সাকিলা মতিন মৃদুলা**
উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক
গণসাক্ষরতা অভিযান

## তিস্তা চরাঞ্চলের শিশুরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত উপজেলার মহিষখোচা ইউনিয়নের তিস্তার চরাঞ্চলের শিশুরা। নদীগর্ভে বসতভিটা বিলীন হয়ে যাওয়ার পর এসব পরিবারের আশ্রয় হয়েছে চর গোবর্ধন ও চাঁদের চরে। এ চরে রয়েছে প্রায় শতাধিক পরিবারের বসবাস। অথচ এ চরে নেই কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়।

জানা গেছে, উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের নদীবেষ্টিত ও অবহেলিত একটি ইউনিয়নের নাম মহিষখোচা। প্রতি বছর তিস্তা নদীর ভাঙ্গনের শিকার হয়ে শত শত পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন। আবার অনেকেই আশ্রয় নিচ্ছেন চরাঞ্চলের এসব অভাবী লোকজন বসে নেই। জীবন বাঁচার তাগিদে ধু ধু বালুচরে চাষাবাদ করেছেন বিভিন্ন ফসলের। এসব ফসলের মধ্যে রয়েছে মিষ্টি কুমড়া, বাদাম, গম, মিষ্টি আলুসহ আরও অনেক কিছু। আবার অনেকেই বাড়ির পাশে গড়ে তুলেছেন সবজি বাগান। কেউ বা করেছেন গরু, ছাগল ও হাঁস, মুরগিরও খামার। তারপরেও এসব লোকজনের চোখে-মুখে নেই ক্লান্তির ছাপ। চরাঞ্চলের লোকজন সংগ্রাম করে বাঁচতে চায়। এদের একটাই দাবি, 'হামরা রিলিফ চাই না, হামরা ছাওয়া পোয়াক ( ছেলে- মেয়ে) লেখাপড়া শিখাবার চাই।' কোমলমতি শিশুদের সাথে তাদের মা-বাবাও এসেছেন শিক্ষার দাবিতে। এদিকে চরের স্বাস্থ্যসেবার রয়েছে বেহাল দশা। শিশুরা পাচ্ছেন না ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা। ফলে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত থেকেই যাচ্ছেন এসব কোমলমতি শিশুরা।

*ইত্তেফাক* ১.০২.২০১৫

## অতিরিক্ত ফি ফেরত দিতে রায়পুরায় ৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিঠি

রায়পুরায় চলমান এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার নামে অতিরিক্ত আদায়কৃত ফি ফেরত দেয়ার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের ৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দিয়েছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৫৫টি। এর মধ্যে দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে ১১টি।

গত ২৮ জানুয়ারি সকল প্রতিষ্ঠানে চিঠি পৌঁছানো হয়েছে। এতে উল্লেখ রয়েছে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি সরকারের নির্ধারিত ফি'র চেয়ে অধিক টাকা আদায় করে থাকে, তাহলে চিঠি প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত আদায়কৃত টাকা ফেরত দিয়ে লিখিত আকারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে দাখিল করতে হবে। কিন্তু চিঠিপ্রাপ্তির ৪/৫ দিন পেরিয়ে গেলেও কোন প্রতিষ্ঠান মঙ্গলবার পর্যন্ত চিঠির উত্তর লিখিত আকারে পৌঁছেনি শিক্ষা অফিসে।

এ ব্যাপারে সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আলতাফ হোসেন বলেন, উপজেলার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আদায়কৃত অতিরিক্ত ফির টাকা ফেরত দিতে চিঠি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন চিঠির উত্তর লিখিত আকারে এখনও অফিসে জমা হয়নি।

*ইত্তেফাক* ৫.০২.২০১৫

## লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে দেশের শিক্ষাকার্যক্রম

লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে দেশের শিক্ষাকার্যক্রম। চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় সীমাহীন অনিয়শ্চয়তায় পড়েছে চার কোটি ৭৪ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৪ জন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা নিয়েও সংশয় কাটছে না।

বছরের শুরুর দিন থেকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ক্লাস শুরুর কথা থাকলেও কোথাও নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়নি। স্কুলগুলোতে রি-অ্যাডমিশন এখনো শেষ হয়নি। কলেঝে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও ভাটা পড়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস ও পরীক্ষা হচ্ছে ধুঁকে ধুঁকে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

দেশের চলমান রাজনৈতিক সঙ্কটে সরকার ও বিরোধী দলের অনড় অবস্থানের কারণে পুরো শিক্ষাব্যবস্থা থমকে গেছে। হরতালের মধ্যেই প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়া হলেও পরে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচিতে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু করা যায়নি। প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার্থীদের নতুন ক্লাসে ভর্তি এখনো শেষ হয়নি। দেশের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম ভিকারুন নিসা নূন স্কুলে পুনঃভর্তির সময় নতুন করে ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পুনঃভর্তির নতুন সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। আরেক সেরা স্কুল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পুনঃভর্তির সময়ও বাড়ানো হয়েছে বলে গতকাল জানিয়েছেন অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা। তিনি বলেন, চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অবরোধের মধ্যেও ক্লাস চালু রাখতে হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কম। আর হরতালের মধ্যে ক্লাস বন্ধ রাখা হয়। শিক্ষা ক্যালেন্ডারের এক মাস কোনো ক্লাস করা যায়নি। এসএসসি পরীক্ষা নেয়া যাচ্ছে না। আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষার থী হবে? তিনি বলেন, এরূপ অনিশ্চয়তার অবসান হওয়া দরকার। সেন্ট যোশেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব্রাদার রবি পিউরিফিকেসন বলেন, এক বছরের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের কোর্স শেষ করতে হবে। এখন ক্লাস করতে না পারলে তারা পিছিয়ে পড়বে।

অন্য দিকে অব্যাহত হরতাল-অবরোধের প্রভাব পড়েছে দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনেও। সব ক্লাস, পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। যেগুলোতে ক্লাস হচ্ছে সেগুলোতেও উপস্থিতির হারও খুব কম। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক(সম্মান) শ্রেণীর ক্লাস শুরুর কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। অনেকের ভর্তিই এখনও সম্পন্ন হয়নি।

*নয়াদিগন্ত* ৯.০২.২০১৫

## বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা পেলো তিন স্কুলগামী

রংপুরের বদরগঞ্জে তিন স্কুলগামীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। প্রশাসনের সহযোগিতায় চারদিনের ব্যবধানে ওই বাল্যবিবাহ বন্ধ করে দেন বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের কর্মকর্তারা। শনিবার উত্তর বাওচণ্ডি বালাপাড়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের মেয়ে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী আয়েশা সিদ্দিকার (১০) সাথে এক যুবকের বিবাহের দিন ধার্য করা হয়। ব্র্যাকের কর্মকর্তারা মেয়ের বাবা-মাকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বুঝিয়ে বিয়ে বন্ধ করে দেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ বলেন, চার দিনে অপরিণত বয়সের তিন স্কুলছাত্রীর বিবাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ১৫ জুনের মধ্যে বদরগঞ্জ উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা হবে।

*ইত্তেফাক* ১৬.০২.২০১৫

## বড়ছড়ায় স্কুল নির্মাণের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে গ্রামবাসী

কক্সবাজার শহরতলীর বড়ছড়া গ্রামে স্কুল নির্মাণের দাবিতে অবশেষে আন্দোলনে নেমেছে গ্রামবাসী। মঙ্গলবার দরিয়ানগরে এক প্রতিবাদ সভায় চলতি মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু না হলে ১ মার্চ থেকে মেরিন ড্রাইভ সড়ক অবরোধ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়।

বড়ছড়া সমাজ পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ইসমাইল সওদাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় বলা হয়, জেলায় স্কুলবিহীন ২৭টি গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য সরকার ২০১৩ সালে অর্থ বরাদ্দ দেয়। এরই অংশ হিসেবে

ঝিলংজা ইউনিয়নের বড়ছড়া গ্রামে একটি স্কুল নির্মাণের জন্য ৬২ লাখ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

ইতোমধ্যে স্কুল নির্মাণের জন্য ৩০ শতক খাস জমি স্কুলের নামে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। কিন্তু এরপর ২ বছর সময় অতিবাহিত হলেও সংশ্লিষ্টদের অবহেলার কারণে স্কুল নির্মাণ কাজ এখনও শুরু হয়নি। এ কারণে এলাকার কয়েক শত স্কুলগামী শিশু শিক্ষাবঞ্চিত রয়েছে।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা আবদুল খালেক, কাজী আবদুল খালেক, বড়ছড়া সমাজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাহবুব আলম, সাবেক সভাপতি আমির হোসেন সওদাগর, রিজিয়া বেগম, মনোয়ারা বেগম মনু, ছৈয়দ আলম প্রমুখ।

*ইত্তেফাক ১৯.০২.২০১৫*

## মাতৃভাষায় লেখাপড়া শিখছে বান্দরবানের পাহাড়ি শিশুরা

বান্দরবানে মাতৃভাষায় লেখাপড়া শিখছে পাহাড়ি শিশুরা। কারিতাস সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (আইসিডিপি)-সিএইচটির আওতায় আলীকদম উপজেলার চারটি গ্রামে পাহাড়ি শিশুদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। পাড়াকেন্দ্রগুলো হচ্ছে– ভারত মোহনপাড়া, কলার ঝিরি, রোয়াম্ভু ও সোনাইছড়ি এলাকার পানিঝিরি। এসব গ্রামে ও পাড়ার স্কুলগুলোতে আদিবাসী ভাষায় শিশুদের লেখাপড়া করানো হচ্ছে। স্কুলগুলোয় ১২ জন পাহাড়ি শিক্ষক কর্মরত। বর্তমানে পাড়াকেন্দ্র স্কুলগুলোয় ১৮৯ জন পাহাড়ি ছেলেমেয়ে শিক্ষাগ্রহণ করছে। কারিতাসের পাড়াকেন্দ্র স্কুলগুলোতে মূলত বিদ্যালয় থেকে ঝরে পরা ও শিক্ষাবঞ্চিত পাহাড়ি শিশুদের শিক্ষামুখী করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভারত মোহন পাড়াকেন্দ্র স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মন্দিরা চাকমা বলেন, উন্নয়ন সংস্থা কারিতাসের সহযোগিতায় পাহাড়ি শিশুদের শ্রেণিকক্ষে নিজের মায়ের ভাষায় (মাতৃভাষায়) লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে। শিশুদের মাটির ওপর বিছানায় পাঠ গ্রহণে মনোনিবেশ করানোর কাজ চলছে। কারিতাসের সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (আইসিডিপি) কর্মকর্তা গীতা চাকমা জানান, শিক্ষাদানের পাশাপাশি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সরঞ্জামসহ আনুষঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে কারিতাসের পক্ষ থেকে। ২০০৩ সালে আলীকদম উপজেলায় গ্রামভিত্তিক এই শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে।

*আমাদের সময় ২২.০২.২০১৫*

## ২২ হাজারেরও বেশি বিদ্যালয়ের এখন মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ

দেশে ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ২০ হাজার ৫০০ মাধ্যমিক এবং এক হাজার ৫১৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে ৪২ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ৪ লাখ শিক্ষককে পিটিআই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্রুত আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে তথ্যপ্রযুক্তি সাহায্য করবে। কারণ শুধু বই দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের আন্তরিকতার অভাবে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রতি সেভ দ্য চিলড্রেনের 'ম্যাপিং আইসিটি ইন এডুকেশন ইনিসিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

প্রধানমন্ত্রীর দফতরের একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের পলিসি অ্যাডভাইজার আনির চৌধুরী আইসিটি এডুকেশন মিথস প্রসঙ্গে বলেন ১ লাখ ৪৩ হাজার ৩৫৬ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৭ হাজার ৮৮০ শিক্ষকের মধ্যে ৩৯ ভাগ নারী শিক্ষক রয়েছেন। প্রাথমিক শাখায় ৩০৫ ই-বুক রয়েছে। এসব শ্রেণীকক্ষে ল্যাপটপ, প্রজেক্টর ও ইন্টারনেট মডেমসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণপদ্ধতি উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনের 'ম্যাপিং আইসিটি ইন এডুকেশন ইনিসিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণার তথ্যে জানা যায়, ইলেকট্রনিক কনট্যান্ট শেয়ারিংয়ের জন্য ওয়েব পোর্টাল তৈরি, শিক্ষকদের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য স্থাপিত কমিউনিটি শিক্ষা কেন্দ্রে সীমিত পরিসরে তথ্যপ্রযুক্তি বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। তবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন, ই-লার্নিং এবং কর্মসূচি তদারক ও মূল্যায়ন সহায়তায় তথ্যপ্রযুক্তি বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। সেভ দ্য চিলড্রেনের পরিচালক (কর্মসূচি উন্নয়ন ও মান) শ্যরন হাউসার জানান, এ গবেষণা তথ্য দেশের শিক্ষা খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে কৌশলগত দিকনির্দেশণা নির্ধারণের লক্ষ্যে শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার জানতে এবং বিশ্লেষণে সহায়তা করবে। অন্যদের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ফাইজুল কবীর এবং শিক্ষাবিষয়ক উর্ধ্বতন উপদেষ্টা এম হাবিবুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

*যুগান্তর ২২.০২. ২০১৫*

## শিক্ষা আইন কবে

প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িতদের সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছর নির্ধারণ, স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন, পাবলিক পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক ও প্রশ্ন-প্রণেতাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্যদের নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা 'স্নাতক' নির্ধারণ, মাধ্যমিক স্তরে নোট-গাইডবই বন্ধ এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী তৎপরতায় জড়িত হলে কঠোর শাস্তির বিধান রেখে প্রণীত শিক্ষা আইনের খোঁজ নেই। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ কমিটির সদস্যরা বলছেন, এ আইন না হওয়ায় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নও ঝুলে যাচ্ছে।

২০১০ সালে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশে শিক্ষানীতি কার্যকর হওয়ার এক মাসের মধ্যে আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। জাতীয় শিক্ষানীতির ২৭ অধ্যায়ের ১ নম্বর অনুচ্ছেদে শিক্ষা প্রশাসনে গতিশীলতা আনতে একটি 'সমন্বিত শিক্ষা আইনের কথা বলা হয়েছিল।

আইনটির খসড়া প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মাসব্যাপী প্রণীত খসড়া আইনের ওপর জনসাধারণের মতামত নেওয়া হয়। এর পর সেসব মতামত খসড়ায় সন্নিবেশিত করে 'শিক্ষা আইন-২০১৪-এর চূড়ান্ত খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ে পাঠানো হয়। ভেটিং এরই মধ্যে শেষ হলেও কী কারণে তা আটকে আছে, তা কেউই স্পষ্ট করে বলতে পারেন না। বর্তমানে পাবলিক পরীক্ষা আইনে প্রশ্ন ফাঁসের শাস্তি সর্বোচ্চ চার বছর কারাদণ্ড। শিক্ষা আইনের প্রণীত খসড়ায় তা বাড়িয়ে ১০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং-বাণিজ্যে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে গাইডবই, নোটবই তৈরি এবং সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

আইনটি কেন প্রণয়ন করা হচ্ছে না?- জানতে চাইলে বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থানরত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ টেলিফোনে সমকালকে বলেন, খসড়া প্রণয়নের পর তাতে আরও বেশ কিছু সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব এসেছিল দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন মহল থেকে। সেগুলোকেই স্থান দিতে গিয়ে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। শিগগিরই তা ছূড়ান্ত করে পাসের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

*সমকাল ২৪.০২.২০১৫*

## পরিকল্পনা সভা

গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে গত ৭ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় পর্যায়ে 'গ্লোবাল অ্যাকশন উইক-২০১৫ উদযাপনকে সামনে রেখে এ বিষয়ক পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ৭টি সহযোগী সংস্থা, গ্লোবাল অ্যাকশন উইক-২০১৫ উদযাপন সংক্রান্ত ওভারসাইট কমিটি ও অভ্যন্তরীণ বাস্তবায়ন কমিটির ২৬ জন প্রতিনিধি নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সপ্তাহ উদযাপন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অভিযানের সহ-সভাপতি ও প্রফেসর এমিরেটাস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ড. মনজুর আহমেদ।

সভায় এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান। GAW ২০১৫-এর প্রতিপাদ্য (ACTION!) অ্যাকশন! এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারাবিশ্বে এবছর GAW পালিত হবে। এবারের GAW ২০১৫-এর কর্মসুচির মূল বিষয় হলো:

২৬ এপ্রিল ২০০০ সালে ইএফএ-এর ঘোষণার সময় যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল, এবছর তাদের বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হলো। এদের মধ্যে যারা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে এবং যারা পায়নি তাদের নিয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে বাংলাদেশে গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ ২০১৫-এর কর্মসূচি আবর্তিত হবে। GCE-এর এবারের প্রতিপাদ্যের আলোকে অভিযান একটু বড় পরিসরে ৭টি বিভাগের (লোকসংখ্যা ও আয়তন বিবেচনা করে ঢাকা বিভাগে দুটি) ৮টি সহযোগী সংগঠনের সাথে স্থানীয় পর্যায়ে এই কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সভাপতি ড. মনজুর আহমেদ বলেন যে, এবছরের প্রতিপাদ্য বেশ উদ্বাবনীমূলক। তিনি বলেন, ১৫ বছরের সকল কিশোর কিশোরীরদের প্রতিনিধিত্ব যেন থাকে সে বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখাতে হবে। এ ছাড়া কর্মসূচির প্রচারের সময় ও কর্মসূচির ফলাফল প্রকাশের সময় যেন সমগ্র বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয় সে বিষয়ে একান্তভাবে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। এছাড়া রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মসূচিতে যতদূর সম্ভব সমান সংখ্যক কিশোর-কিশোরী বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও আদিবাসীসহ অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপের কিশোর কিশোরীদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেবার বিষয়ে আলোচনা হয়।

**রেহানা বেগম**

## বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকরণ উন্নয়নের জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির সভা

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ গণসাক্ষরতা অভিযান কনফারেন্স রুমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকরণ উন্নয়নের জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মো. শামছুল হুদা, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আবুল কাশেম, পরিচালক (পরিবীক্ষণ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, নাসরীন জাহান, উপ-পরিচালক (পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পরিচালক-প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, টি এম আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ, টেকনিক্যাল অফিসার-বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ড. সালিমা রহমান, নির্বাহী পরিচালক-আরডিআরএস বাংলাদেশ, অধ্যাপক ড. মো. আউয়াল খান-শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন, পরিচালক-ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভাল নারে বি লি টি স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, হোসনে আরা বেগম, কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, ব্র্যাক এবং ইমাম নাহিল, প্রোগ্রাম অফিসার, অক্সফাম। গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন তপন কুমার দাশ, উপ-পরিচালক, ড. মোস্তাফিজুর রহমান, কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, সাকিলা মতিন মৃদুলা, উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, ফারদানা আলম সোমা, কার্যক্রম কর্মকর্তা।

সভায় উপকরণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি, প্রস্তাবিত ম্যানুয়ালের বিষয়বস্তু, উপকরণটি শ্রেণীকক্ষে কার্যকরভাবে ব্যবহারের প্রক্রিয়া, বিদ্যমান উপকরণ সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা এবং উপদেষ্টা পরিষদের কার্যপরিধি নিয়ে আলোচনা হয়।

বাল্যবিবাহ বিষয়ক সচেতনতামূলক উপকরণ উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন ইমাম নাহিল এবং অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন। আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছিল:

- বিগত চল্লিশ বছর ধরে সরকার এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট অনেক প্রতিষ্ঠান বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কাজ করলেও এ বিষয়ে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি।
- এদেশে এখনও বাল্যবিবাহের প্রবণতা ৬৪%। চর অঞ্চলে এই হার আরও বেশী।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সচেতনতা বিকাশী কার্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।
- পাঠ্যপুস্তকে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক থাকলেও শিক্ষকরা তা যথাযথভাবে আলোচনা করেন না। এজন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বিকাশী কার্যক্রম ও মিডিয়া অ্যাডভোকেসি দরকার।

**সাকিলা মতিন মৃদুলা**

## সিটিজেনস্ রিপোর্ট কার্ড: প্রাথমিক শিক্ষা খাত উপদেষ্টা কমিটির সভা

বর্তমানে সিটিজেনস্ রিপোর্ট কার্ড একটি জনপ্রিয় গবেষণা পদ্ধতি, যা সরকারি সেবার মান সম্পর্কে

কমিউনিটির মতামত সংগ্রহ করে। আমাদের দেশের সিংহভাগ জনগণ সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা ও সেবার মান, পর্যাপ্ততা, প্রবেশাধিকার ও নির্ভরযোগ্যতার একটি সার্বিক চিত্র তুলে আনা এবং কিভাবে এই অবস্থার আরো উত্তরণ ঘটানো যায় সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা পাবার লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় ৮টি জেলায় চলমান কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ-এর কর্ম এলাকায় ২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিচালিত হয়েছে। এই জেলাগুলো হলো গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, খুলনা, মেহেরপুর, হবিগঞ্জ, ভোলা, জামালপুর ও নেত্রকোণা।

এই গবেষণার কৌশল ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিকাল ৪টায় অভিযান কার্যালয়ে সিটিজেনস রিপোর্ট কার্ড গবেষণা কর্মের উপদেষ্টা কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গবেষণা কর্মের কৌশল, পদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন কনসালটেন্ট অধ্যাপক আবু জায়েদ মোহাম্মদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত এ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য ও গণসাক্ষরতা অভিযানের ভাইস চেয়ার প্রফেসর এ্যামিরেটাস ড. মনজুর আহমেদ।

**সান্ত্বনা আইউব**

## অমর একুশে শিক্ষামেলা-২০১৫

বাংলা একাডেমীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেবলমাত্র প্রকাশনা সংস্থাগুলো অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ-এর পরিপ্রেক্ষিতে গত দুই বছর ধরে গণসাক্ষরতা অভিযান বাংলা একাডেমীর গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ না পেয়ে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগী সংগঠনের সহায়তায় 'শিক্ষামেলা' আয়োজন করে। এবারও (২০১৫ সালে) বইমেলায়

বাংলা একাডেমীর পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণসাক্ষরতা অভিযান অংশগ্রহণের সুযোগ না পাওয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগী সংগঠন 'মানব উন্নয়ন কেন্দ্র' এবং 'আরবান' এর সহায়তায় অমর একুশে শিক্ষামেলা আয়োজনের করেছে। শিক্ষামেলা আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মেলার মাধ্যমে সবার মধ্যে একুশের চেতনা ও এর তাৎপর্য তুলে ধরা এবং শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ে তৈরি বই ও বিভিন্ন প্রকাশনা সম্পর্কে মেলায় আগত দর্শক-শ্রোতাদের অবহিত করা। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মেহেরপুর জেলায় মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২০-২২ ফেব্রুয়ারি এবং আরবান নেত্রকোনা জেলায় পূর্বধলা উপজেলা অডিটরিয়াম প্রাঙ্গণে ২০-২৬ ফেব্রুয়ারি অমর একুশে শিক্ষামেলা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

মেলাতে শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ক বই, পোস্টার, চার্ট, গবেষণাপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনা প্রদর্শিত হয়। মেলা উদ্বোধনের পর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। মেলাতে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, কবিতা পাঠের আসর, একুশের গান ও নৃত্যানুষ্ঠান, ভাষা আন্দোলন নিয়ে স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা, ভাষা আন্দোলন বিষয়ক ছবি ও ডকুমেন্টারী প্রর্দশন, ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিষয়ক পোষ্টার প্রদর্শন ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। এছাড়াও মেলাতে স্থানীয় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেয়া হয় এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মেলাতে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এসএমসি সদস্য, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি এবং সাধারণ জনগণ দর্শনার্থী হিসেবে আগমন ও মেলা পরিদর্শন করে।

**কাজী আশিক এলাহী**

## কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

গণসাক্ষরতা অভিযানের ২২-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত 'কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি ধারণা প্রদায়ী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ ও

চর্চার মাধ্যমে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়নই এ প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণে দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, সাভার ও ঢাকা জেলার নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ২৫ জন শিক্ষক এবং 'সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস্ স্টাডি' থেকে ১ জন পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।

ড. শোয়াইব জিবরান, অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সৈয়দা আতিকুন নাহার, সহযোগী অধ্যাপক ও ড. মো. আবদুল আউয়াল খাঁন, অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান সরকার, সদস্য, কারিকুলাম-এনসিটিবি, প্রফেসর টি আই সরকার, উপাধ্যক্ষ, রাজউক মডেল স্কুল ও কলেজ, মো. ফরহাদুল ইসলাম ভূইঞা, উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প-মাউশি, ড. সাইফুল আলম, অধ্যাপক, তথ্য বিজ্ঞান ও লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মো. মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, বাউবি প্রশিক্ষণ কোর্সে রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পরিদর্শনের অংশ হিসেবে 'ঢাকা রেসিডেন্সিয়্যাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ'-এর কার্যক্রম পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ বিদ্যালয়ের পাঠদান কৌশল, সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী, বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনাসহ সংশ্লিষ্ট নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সঙ্গে স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময়ও করেন।

এই কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে পিটার ডিটজেল, নির্বাহী পরিচালক, নেটজস্ বাংলাদেশ বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর এর জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

**মিজানুর রহমান আখন্দ**

# সোয়াইন ফ্লু: বিশ্ব ও বাংলাদেশ পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয়

সাম্প্রতিক সময়ে জীবনবিনাশী সোয়াইন ফ্লু বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এ ফ্লু আক্রান্ত কোনো রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই এ বিষয়ে জনগণের আতঙ্কিত হওয়ারও কিছু নেই।

## সোইয়ান ফ্লু প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য:

সোয়াইন ফ্লু এক নতুন ধরনের মারাত্মক ইনফ্লুয়েন্জা। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নিকট ভাইরাসটি H1N1 নামে পরিচিত। ভাইরাসটি শূকরের শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

## এটা কিভাবে ছড়ায়?

এটি প্রথমে শূকর থেকে মানবদেহে ছড়ায়। পরে মানুষের মুখ বা নাক দিয়ে ভাইরাসটি মানুষের শরীরে ঢোকে। ফলে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত মানুষের হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ভাইরাসটি অন্য মানুষের দেহে খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে।

**উল্লেখ্য, খাদ্যের মাধ্যমে সোয়াইন ফ্লু ছড়ায় না বা এভাবে কেউ আক্রান্ত হয় না।**

## এ রোগের উপসর্গসমূহ

এ রোগের উপসর্গসমূহ হচ্ছে: জ্বর, মাথা-ব্যথা, গলা ও শরীর ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, আলস্য বোধ, ক্ষুধামান্দ্য, ওজন হ্রাস ইত্যাদি।

## কাদের জন্য বেশি বিপজ্জনক?

হাপাঁনি ও হৃদরোগী এবং খুব বেশি বয়স্ক ও ছোট শিশুদের জন্য এই রোগ বেশি বিপদজ্জনক। এই ভাইরাস ব্রংকাইটিস ও নিউমোনিয়ার মতো মারাত্মক রোগ বিস্তারে সহায়তা করে।

## কি ধরনের ঔষধ চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে?

সোয়াইন ফ্লুর প্রতিরোধের কোন ভ্যাকসিন নেই। এন্টি-ভাইরাল ঔষধ শুরুতেই সেবন করা ভাল।

## কীভাবে ফ্লু থেকে দূরে থাকা যায়

- কফ বা সর্দি বের করার সময় টিসু/পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলা। ব্যবহারের পর টিসু/পরিষ্কারটি নিরাপদ স্থানে ফেলা।
- কফ বের করার পর হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলা।
- আক্রান্ত হলে কর্মস্থলে না গিয়ে বাড়িতে থাকা, সুস্থ ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা এবং জরুরি ভিত্তিতে স্বাস্থসেবা গ্রহণ করা।

**সূত্র:** *এপি, এএফপি, ডবিওএইচও, প্রথম আলো, দি ডেইলি স্টার ও ইন্টারনেট*

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

# সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৪৯ ফাল্গুন ১৪২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংখ্যা


## সম্পাদক

এবারের ফেব্রুয়ারি বেশ একটু অন্যরকমভাবে পার করলাম আমরা। সেই অন্যরকমটা অবশ্য নেতিবাচক অর্থে। এই মাসে আমরা সবচেয়ে বেশি আনন্দের সঙ্গে আমাদের স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় অক্ষুণ্ন রাখার ব্রত উদ্‌যাপন করি। খুব বড় মুখ করে আমরা বলে থাকি, ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন জাতি আমাদের মত রক্ত দান করেনি, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেনি। অকাট্য সেই সত্যের গৌরব নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করি। এই মাসেই প্রকৃতির অবিনাশী পরিক্রমায় বসন্তকে আবাহন করি আমরা। পলাশ আর শিমূলের রঙ আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। পহেলা ফাল্গুনের আদি বাঙালি ঐতিহ্যের সঙ্গে এই সমকালে এসে যোগ হয়েছে পাশ্চাত্যের ভ্যালেন্টাইন'স ডে। বুঝে, না-বুঝে সেই দিবস উদ্‌যাপনে যেন নেশা লেগে গেছে এই সদা-সাম্প্রতিক কালে। ভাষিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঘোষণার সঙ্গে এই নতুন তারুণ্যের অভিলাষী চলটাও বেশ মানিয়ে গেছে।

সংস্কৃতির রাজনৈতিক মাত্রা যদি সংযোজন করি তাহলে একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। যেহেতু গত শতকের মধ্যভাগে পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মত কোন নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষ এখন দৃশ্যমান নয়, তাই সারা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে আমরা সেই বায়ান্নর স্মৃতি-কীর্তির উত্তাপ পোহাই। যে দুঃখিনী বর্ণমালার মুক্তির জন্য তরুণরা শহীদ হতে ভয় পায়নি, আজ তার বৈভব বেড়েছে। সারা মাস জুড়ে বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। উচ্ছ্বাস প্রকাশে বাঙালিকে দমিয়ে রাখা ভার। তাই যোগাযোগের মাধ্যম একে প্রাণের মেলা বলে মালা পরিয়ে দিয়েছে। এই অভিধাটা বেশ মানিয়ে গেছে। মেলাটা প্রকাশনায় সংখ্যায়, প্রকাশকদের সংখ্যায়, স্টলের প্রাচুর্যে, সেইসব স্টলের রূপচর্চার বিলাসিতায় এমন ঐশ্বর্যময়ী ও বিশাল হয়ে উঠেছে যে, তার পরিসর বাড়তে বাড়তে বাংলা একাডেমির চত্বর পেরিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্মুক্ত সবুজকে দখল করে নিয়েছে। অক্ষর, শব্দ, বাক্য, বিষয়, ভাবনার প্রকাশ নিয়ে আয়োজিত এমন একটা উৎসবে মানুষের সম্মিলনীতে এবারও অবশ্য বড় ধরনের ঘাটতি চোখে পড়েনি।

কিন্তু তবুও ওই প্রাণের উৎসবে আনন্দের রাগটা বুঝি তেমনভাবে বাজেনি। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, একটা বড় রাজনৈতিক শক্তির সারা মাস জুড়ে দিনের পর দিন হরতাল ও অবরোধের ডাক স্বস্তির সংকট সৃষ্টি করেছিল। ঠিক এই সময় একটা ভয়ের সংস্কৃতি আমাদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। বইমেলার বিদায় ঘন্টা যখন বাজতে শুরু করেছে, তখন মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের আঘাতে নিহত হলেন মুক্তবুদ্ধি ও বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের যুক্তিবাদী লেখক ও সংগঠক অভিজিৎ রায়। ফেব্রুয়ারির গায়ে আবার রক্তের সহিংস ছোপ। কিন্তু আমরা যেন একুশের চেতনায় ফিরে যাই। দৃপ্ত কণ্ঠে যেন উচ্চারণ করতে পারি, একুশের সবচেয়ে বড় মানে হল মাথা নত না করা।


**উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক শফি আহমেদ

**সম্পাদক**
রাশেদা কে. চৌধূরী

**প্রচ্ছদ**
অশোক কর্মকার



গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত



সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন:৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org